আমি কবিতার নাম এবং কবির নাম বলে মুখ ভোতা করে দাড়িয়ে আছি। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। একটা লাইনও মনে পড়ছেন। কেঁদে ফেলা ঠিক হবে কি না তাও বুঝতে পারছিনা। হঠাৎ স্পষ্ট শুনলাম আমার কানের কাছে কে যেন শান্ত গলায় বলল-"সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত"। আরে এটাই তো কবিতার প্রথম লাইন। আমি গড় গড় করে বলে যাচ্ছি। যেখানে আটকানোর আশঙ্কা সেখানেই কেউ একজন বলে দিচ্ছে। বালক বয়েসে ব্যাপারটা অতি বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। এখন জানি এটা মস্তিষ্কের খেলা। পুরো কবিতাটাই অবচেতন মনে জমা করা আছে। অবচেতন মস্তিষ্ক চেতন মস্তিষ্ককে সময় মত তথ্য পৌছে দিচ্ছে। প্রকৃতি রহস্যময় আচরণ করলেও প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করেনা।"

তাই কি! প্রকৃতির রহস্যময়তার সাথে কি আধিভৌতিকতার স্পর্শ আছে বলে মনে হচ্ছেনা? আবার হুমায়ুন আহমেদ পড়ুন: William Faulkner বলেছেন, একজন লেখকের obituary হওয়া উচিত এক লাইনের। He wrote books, then he died. মানুষটা বই লিখেছে, তারপর মারা গেছে।

বাহ চমৎকার। এর চেয়েও সুন্দর একটা কথা লিখি? আমার প্রিয় লেখক Jorge Luis Borges বলেছেন-– When writers die they become books, which is after all, not too bad an incarnation.মৃত্যুর পর লেখকেরা বই হয়ে যান। এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে?

পুনশ্চ: আমি যে পিতৃভক্ত ছেলে এই তথ্যটা নিশ্চয় ইতোমধ্যে পাঠকরা জেনেছেন। অতি সঙ্গত কারণে প্রশ্ন উঠতে পারে, এমন পিতৃভক্ত একজন ছেলে ত্রিশ বছর পর বাবার কবর দেখতে যায় কি ভাবে? ঢাকা থেকে পিরোজপুর যেতে আট ঘণ্টা সময় লাগে।

প্রশ্নটার জবাব আমার কাছে নেই।

সবার ব্যস্ততা। কেই সময় বের করতে পারে না। কত কিছু। অমরা জটিল আধুনিক এক জগতে বাস করি।

তারপরেও ত্রিশ বছর পর হঠাৎ সবাইকে জড়ো করে কেন কবর স্থানে গেলাম গল্পটা বলা দরকার। এই গল্পে সামান্য supernatural touch আছে।

বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে "সবুজ সাথী" নামের প্রেসক্রিপসন নাটক নিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে। এই সিরিয়ালটির লেখক এবং পরিচালক যেহেতু আমি, আমাকেও প্রতিটি অনুষ্ঠানে থাকতে হচ্ছে। খুলনার অনুষ্ঠান শেষ করে আমারা যাচ্ছি বরিশালে। গাড়ি করে যাচ্ছি। আমার সংগে আছেন আসাদুজ্জামান নূর, জাহিদ হাসান এবং অভিনেত্রী-গায়িকা শাওন। ত্রিশ বছর পর এই অঞ্চলে প্রথম যাত্রা। সব কিছু বদলে গেছে। আমি যাচ্ছি ঘুমুতে ঘুমুতে। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। আমি প্রায় চেঁচিয়ে বললাম, ড্রাইভার সাহেব, গাড়ি থামান। গাড়ি থামান।

আসাদুজ্জামান নূর বললেন, সমস্যা কী, শরীর খারাপ লাগছে?

আমি বললাম, শরীর খারাপ না, তবে কেমন জানি লাগছে। মনে হচ্ছে আমি অতিপরিচিত জায়গায় এসেছি।

গাড়ি থামল। আমি ঘোর লাগা অবস্থায় গাড়ি থেকে নামলাম। কিছুই চিনতে পারছি না। খুলনা –বরিশাল হাইওয়ের একটি অংশে গাড়ি দাড়িয়ে আছে। আমি বিব্রত ভঙ্গিতে বললাম, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে খুব কাছে কোথাও আমার বাবার কবর।

জাহিদ বলল, কী বলেন হুমায়ুন ভাই?

শাওন বলল, উনি যখন বলছেন তখন একটু খুঁজে দেখলে হয়।

বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। একজন বলল, সামান্য পেছনে গেলেই পিরোজপুর গোরস্থান। আমি সবাইকে নিয়ে গোরস্থানে ঢুকলাম। আমরা কবর জিয়ারত করলাম। শাওন বলল, আমি আমার জীবনে অতি রহস্যময় একটা ঘটনা দেখলাম। ছেলে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে বাবা ছেলেকে ডেকে পাঠালেন।

সব ঘটনার পেছনেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকে। আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ার পিছনেও নিশ্চয়ই কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। থাকলেও আমি তা জানিনা।

বরিশালে অনুষ্ঠান শেষ করে ঢাকা ফিরেই আমি সব ভাইবোন এবং মাকে নিয়ে পিরোজপুর গোরস্থানে এসে উপস্থিত হলাম।"

বল পয়েন্ট- এ আধিভৌতিকতার কাহিনী শেষ। এখন আরেকজন প্রখ্যাত প্রয়াত লেখক আহমদ ছফা-কে নিয়ে হুমায়ুন আহমেদ এর একটি স্মৃতি কথা লিখে শেষ করছি।

"ছফা ভাইকে নিয়ে আমার অসংখ্য স্মৃতি আছে। তার ওপর দুশ' পাতার একটা বই আমি অবশ্যই লিখতে পারি। এখানে একটি স্মৃতি উল্লেখ করছি। ১৯৮৫ বা '৮৬ সালের কথা। এতদিন লেখালেখির জগতে থেকেও ছফা ভাই বাংলা একাডেমী পুরষ্কার পাননি। আমি পেয়েছি অথচ ছফা ভাই পাননি, খুবই লজ্জিত বোধ করি। কীভাবে কীভাবে আমি তখন বাংলা একাডেমীর কাউন্সিলারদের একজন। পুরষ্কার কমিটিতে আছি। আমি জোরালো ভাবে ছফা ভাইয়ের পুরষ্কারের ব্যাপারটা বললাম। যথারীতি তা নাকচও হয়ে গেল। আমি ছফা ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করেছি-এই খবর ছফা ভাইয়ের কানে পৌঁছল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তার বাসায় উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, হুমায়ুন, আপনার এত বড় স্পর্ধা যে আপনি আমার জন্য সুপারিশ করেন!

আমি চেয়ারে বসেছিলাম। চেয়ার থেকে উঠে হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

ছফা ভাই বললেন, আমি বসতে না বলা পর্যন্ত এই ভাবে দাড়িয়ে থাকবেন।

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

আপনি আর কখনই আমার বাসায় আসবেন না।

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

ছফা ভাইয়ের সঙ্গে এটাই সম্ভবত আমার শেষ দেখা। ভুল বললাম, আনিস সাবেত ক্যানসারে মারা যাওয়ার সংবাদ দিতে আমি আরও একবার তার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর 'আনিসরে' 'আনিসরে' বলে চিৎকার করে কাঁদলেন।

কান্না বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার নিজের ভুবনে ঢুকে গেলেন। চলে গেলেন রিয়েলিটির বাইরে। আনিস সাবেত ট্রাস্টি বোর্ড করতে হবে। সেই ট্রাস্টি দুস্থ লেখকদের বৃত্তি দেবে। দরিদ্র লেখকদের বই প্রকাশনার দায়িত্ব নেবে। ট্রাস্ট ফান্ড একটা আধুনিক স্কুল করবে টোকাইদের জন্য।

তিনি কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলেন ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচালক কারা কারা থাকবেন তাদের নাম লেখার জন্য। ট্রাস্টি বোর্ডের নীতিমালাও লিখতে হবে। তাকে দারুণ উত্তেজিত মনে হল। তিনি লিখছেন, আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছি অন্য ভুবনের মানুষটিকে।

আমাকে নিয়ে ছফা ভাইয়ের অনেক স্বপ্ন ছিল। আমি তার কোনাটাই পূরণ করতে পারিনি। এত মেধা আমার ছিলনা। প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা বৃত্ত থাকে। কেউ সেই বৃত্তের বাইরে যেতে পারেনা। আমিও পারিনি ছফা ভাই নিজেও পারেননি। তাকে বন্দি থাকতে হয়েছে নিজের বৃত্তেই।"

জিল্লুর রশিদ ভুঁইয়া: বাংলাদেশীদের গর্ব

মাহমুদা রহমান

আগামী ২৮শে মার্চ অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সরকার নির্বাচন। এই নির্বাচনে লেকেম্বা আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন লেবার পার্টির জিহাদ দিব এবং এই প্রথম বার এর মত লিবারেল পার্টি থেকে বাংলাদেশ এর জনাব জিল্লুর রশিদ ভুঁইয়া। তিনি নরসিংদী জেলার স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। গতবারের প্রার্থী মাইকেল হাওয়াত নিউ সাউথ ওয়েলস এর এমপি হিসাবে তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় জনাব জিল্লুর রশিদ ভুঁইয়া এই আসনে মনোনয়ন পান। লেবানিজ, বাংলাদেশী অভিবাসীতে ভরপুর লেকেম্বা উপশহরটি। ১৯২৭ সাল থেকে এই আসনটি এক বারের জন্যও হাতছাড়া হয়নি লেবার পার্টির। সেই দিক থেকে প্রথমবার একজন বাংলাদেশী প্রার্থীর লিবারেল পার্টি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। এন এস ডাব্লিউ কে নতুন ভাবে পুনর্গঠনে লিবারেল পার্টি once -in -a -generation পরিকল্পনা নিয়েছে। এর মধ্যে নতুন রাস্তা এবং রেল প্রজেক্ট, স্কুল, হাসপাতাল, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধা তৈরি করার প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হবে। দীর্ঘদিন ধরে অটল অবস্থান কারী লেবার পার্টির ইমেজ এর বিপক্ষে দাঁড়ানো লিবারেল পার্টির অনেক বেশি সাহসিকতার কাজ। এই নির্বাচনে বাংলাদেশী এই প্রার্থী কে জয়যুক্ত করতে একতাবদ্ধ হতে হবে সকল বাংলাদেশীদের। এ যেন গর্জে উঠ বাংলাদেশ !

২০১৪ বাঙ্গালী কমিউনিটি সেবা পদক গ্রহণ করছেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যার শেষ কোথায়?

(সুবচনের রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আমাদের রাজনৈতিক সমস্যা বড় জটিল আবার এক অর্থে খুবই সরল। নির্বাচন কিভাবে হবে, কারা নির্বাচন চালাবেন, এই নিয়েই ত আসল সমস্যা। ঠিক ছিল নিরপেক্ষ, তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বচন কমিশন ভোট দেওয়া নেয়ার কাজ পরিচালনা করবেন। প্রথম দুই তত্বাবধায়ক সরকার প্রধান-বিচারপতি শাহাবুদ্দিন, বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্বাবধানে ভালোভাবে নির্বাচন হল বড় রকম কোন সমস্যা ছাড়া। এরপরই খেল শুরু হল। তত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের আসনে কি ভাবে নিজেদের লোক বসান যায় সে চেষ্টা চলল। প্রধান বিচারপতির অবসর যাওয়ার বয়স বাড়ল, এক প্রধান বিচারপতি আবার সরকার প্রধান হয়েই প্রশাসনকে নিরপেক্ষ করার নামে ১২-১৪ জন সচিবকে বদল করে দিল। প্রশাসন উল্টো দিকে পক্ষপাতদুষ্ট হল। ড: ইয়াজউদ্দিন প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পর দেখা গেল তত্বাবধায়ক সারকার ব্যবস্থা আর কাজ করছেনা। ১/১১ চলে এল। ড: ফখরুদ্দিন দুবছর সরকার চালিয়ে কোনরকম একটা নির্বাচন দিয়ে মানে মানে(?) সরে গেল।

নতুন সরকার, শেখ হাসিনার সরকার সংবিধান সংশোধন করে তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বদলে আবার সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরে এল। বি এন পি-জামাত জোট মনে করল শেখ হাসিনার সরকারের অধীন নিরপেক্ষ নির্বাচন হতেই পারেনা। তারা তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

পুনর্বহাল চাইল। আওয়ামী লীগ নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থেকে ৫ জানুয়ারী নির্বাচন করে নিল। অদ্ভুত এক নির্বাচন, ১৫৩ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত। অবশিষ্টরাও যেন কেমন কেমন করে ভোট জিতে গেল। সবাই ভাবল এই নড়বড়ে নামকাওয়াস্তে ইলেকশন সংবিধান রক্ষার জন্যে। কিন্তু নেতা- মন্ত্রীদের কথায় বুঝা গেল তা না ইলেকশন ম্যান্ডেটে তারা পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতে চায়। বিরোধীরা মানবে কেন? শুরু হয়ে গেল হরতাল, অবরোধ, আন্দোলন। যার ফল দেশবাসী মাসাধিক কাল ধরে ভোগ করছি। ক্ষয় ক্ষতির ছোট করে দেয়া একটা হিসাব:

বোমা বাজি, আগুন ও সংঘর্ষে নিহত- ত্রিশে র বেশী; প্রায় ৭০০ এর বেশী যানবাহনে অগ্নিসংযোগ; অগ্নিদগ্ধ ৫০জনের কাছাকাছি; আহত অনেক- হিসাব দেওয়া কঠিন।

ব্যবসা বাণিজ্য লাটে উঠেছে, লেখা পড়া গোল্লায় গেছে। আন্দোলনের প্রথম ১৫দিনে অর্থনৈতিক ক্ষতি ৩৬ বিলিয়ন ডলারের বেশী। আর্থিক বছরের প্রথম দিকে রাজস্ব আদায় হয়েছে লক্ষ্যমাত্রারা চেয়ে ১০হাজার কোটি টাকা কম। এভাবে চলতে থাকলে দেশের যে বারোটা বেজে যাবে, সন্দেহ নাই।

আমরা সুবচন ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় দেখিয়েছিলাম, অর্থনীতি ও সামাজিক সুচকে আমরা পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছি। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নের মডেল হিসাবে পরিচিত হচ্ছে। কিন্তু আন্দোলন অবরোধে আমাদের সকল অর্জন বিসর্জন দিয়ে আবার পিছিয়ে পরার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। আমরা কি জেনে শুনে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারছিনা! না কি আমাদের প্রতিবেশীরা চাইছে আমরা নিজেরা গণ্ডগোল করে পিছিয়ে পড়ি, দুর্বল হয়ে যাই। প্রতিবেশীর সুখ অনেকের সহ্য হয়না।

সংলাপ নিয়ে অনেক কথা- বার্তা হচ্ছে, দেশে নাগরিক সমাজ বলে পরিচিত কিছু ব্যক্তি উদ্যোগ নিয়েছেন ‘জাতীয় সংলাপের’। সকল রাজনৈতিকদল, সব শ্রেণী-পেশার লোকজনের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সংলাপ অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। বিদেশ থেকেও সংলাপের চাপ আছে, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ অনেক দেশ চায় সংলাপের মাধ্যমে সংকটের অবসান হোক। জাতিসংঘ থেকেও বলা হচ্ছে সংলাপে বসার জন্যে। বাংলাদেশের চলমান সহিংসতায় সবাই উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশ সরকারের সাথে সমন্বয়ের জন্য জাতিসংঘ তার সাবেক রাজনীতি বিষয়ক সহকারী মহাসচিব অস্কার ফার্নানডোজ তারানকোকে দায়িত্ব দিয়েছে। তিনিও কাজে লেগে গিয়েছেন, মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী(দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া) নিশা দেশাই বিসওয়াল এর সাথে বৈঠক করে বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ সবাই আমাদের নিয়ে অসন্তুষ্ট, উদ্বিগ্ন, তৎপর। কিন্তু আমাদেরই যেন গা নেই, সহিংসতা চলছে চলুক; দেখা যাক কি হয়। আর সংলাপে বসেই বা কি হবে, আগেও তো সংলাপ হয়েছে, লাভ কিছু হয়েছে কি? নির্বাচন নিয়ে মত পার্থক্য দূর করতে ২০১২- ১৩ সালে তারানকো তিনবার ঢাকা আসেন, একবার তো ছয় দিন থেকে বিরোধীদের আলোচনার টেবিলে বসাতে পেরেছিলেন কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। কাজেই সংলাপ থেকে ভাল কিছু আশা করা দুরাশা।

তত্বাবধায়ক সরকার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা উপদেষ্টা হতে অসম্মতি জানিয়েছেন। মনে হয় একটা ডেড ইস্যু নিয়ে ২০দল হরতাল, অবরোধের নামে বীভৎস, অমানবিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। মানলাম শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে ফেয়ার ইলেকশন সম্ভব নয়। কিন্তু এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে তিনি নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে বাধ্য হন। একজন কঠোর, নীতিবান, নির্লোভ ব্যক্তিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (প্র. নি. ক) দায়িত্ব দেওয়া যায়, যিনি প্রধানমন্ত্রীসহ কারও অধীন থাকবেন না, কারও কথা শুনবেন না। তিনি এক অর্থে নিরপেক্ষ, নির্দলীয় সরকার প্রধান হবেন; তবে প্রশাসন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে শুধু ইলেকশন সুষ্ঠু করার চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীকে উপদেশ দিতে পারবেন যা তিনি শুনতে বাধ্য থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী রুটিন কাজ ছাড়া কোন কাজ করতে বা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার, বি জি বি সহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ইলেকশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার অধীন থাকবে। শিশু আর পাগল ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়। কথা ঠিক, কিন্তু আইন, বিধি-বিধান দ্বারা ক্ষমতা বেধে দেওয়া গেলে, হাতে পায়ে বেড়ি দেওয়া গেলে, যে কেউ নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য থাকবেন। মনে হতে পারে, এমন প্র. নি. ক কি পাওয়া যাবে, এতো সোনার পাথর- বাটি। অবশ্যই আমাদের দেশে এমন সোনার মানুষ মিলবে যিনি নিরপেক্ষ নির্বাচন করে দেশকে সংকট মুক্ত করতে পারেন।

আমাদের প্রধান সমস্যা অবিশ্বাস; দুই বিরোধী দলসহ তাদের সমর্থনকারী জনসাধারণও পরস্পরকে বিশ্বাস করিনা। দুই নেত্রী তাদের ইগো নিয়ে আছেন, আর আমরা জনসাধারণ তাদের তালে তাল দিচ্ছি। কিন্তু এভাবে আর চলতে পারে না, স্পষ্ট ভাবে বলতে হবে আপনারা এভাবে চললে আমরা আর আপনাদের সাথে নেই, আমরা আপনাদের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করব। শিগগিরই একটা সমাধানে আসুন।

আরেকটা সহজ সমাধানের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। একটা গণভোটের ব্যবস্থা করা যায়। তত্বাবধায়ক সরকার- এর দ্বারা নির্বাচন হবে কি না- এই ইস্যুর ওপর । হ্যাঁ অথবা না ভোটের মাধ্যমে জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে কিভাবে নির্বাচন হবে। তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অথবা সংসদীয় ব্যবস্থা বহাল থাকবে। ইস্যুটিকে আর না পেঁচিয়ে সকল সুধীজনকে শ্বাসরূদ্ধকর পরিস্থিতি দেশকে উদ্ধারের অনুরোধ জানাই।

ডানা ফাবিয়া ভূঁইয়াঃ

মাত্র উনিশ বছরের সদা হাস্যময়ী, কোমল, নম্র স্বভাবের মেয়ে ছিল ডানা ফাবিয়া ভূঁইয়া; অস্ট্রেলিয়ার প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ল্যাকেম্বার লিবারেলের এমপি পদপ্রার্থী রশীদ ভূঁইয়ার জ্যেষ্ঠ কন্যা। স্টেট নির্বাচনের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে যখন সবাই ভীষণ ব্যস্ত নির্বাচনী প্রচারণা সফলভাবে সম্পাদনের আশায়, ঠিক তখনই স্নেহময়ী পিতা রশীদ ভূঁইয়াকে তুলে নিতে হল পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বস্তু - সন্তানের লাশটিকে কাঁধে বহন করার। পিতা হিসেবে এর চেয়ে বড় মর্মান্তিক আর কি হতে পারে? ১২ মার্চ, ২০১৫ বৃহস্পতিবারটি ছিল ডানার সাপ্তাহিক অন্যান্য দিনগুলোর মতোই স্বাভাবিক। ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন সিডনির স্কুল অফ বিজনেস এন্ড ল' এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ডানা, সেদিনও সকালে চলে যায় ক্লাসে। বাবা রশীদ ভূঁইয়া নির্বাচনী প্রচারণার কাজে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় সকাল এগারোটায় দেখছে ছোট মেয়েটি ডানার সাথে ফোনে চ্যাট করছে। ডানার মাঝে মাঝে শ্বাস কষ্ট হতো। তবে কখনই সেটা মারাত্মক পর্যায়ের ছিলনা। এদেশের ডাক্তাররাও কখনই হাজারো টেষ্ট করে এর উল্লেখযোগ্য কোন সুরাহা করতে পারেনি। শুধু নিষেধাজ্ঞা ছিল চিংড়ি খাওয়ার ব্যাপারে। এমনটা ভার্সিটিতে ঐ মুহূর্তে ঘটেছে কিনা - তা করোনার রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না। হঠাৎ বন্ধুরা লক্ষ্য করলো শ্বাসকষ্ট; খবর দেয়া হল এ্যাম্বুলেন্স এবং যখন ওয়েস্টমিড হাসপাতালে নেয়া হলো, তার আগেই প্যারামেডিক্সরা ঘোষণা করলো- ' ডানা মৃত' ! রশীদ ভূঁইয়া পরিবারের আরও কষ্ট, মৃত্যুর সময় মেয়েটি আপনজন কাউকেই কাছে পেল না। এতসব ঘটনা তাঁদের সবার অজান্তেই কেমন দ্রুত ঘটে গেল। পরিবারের সবাই যখন রশীদ ভুঁইয়ার নির্বাচনী প্রচারনায় ব্যস্ত, তখন তাঁর আদুরে কন একই শহরের অন্যপ্রান্তে লড়ছে মৃত্যুর সাথে। স্থানীয় পুলিশ বাড়িতে বয়ে নিয়ে আসে রাত আটটায়। রাতের অন্ধকার নেমে আসার আগেই রশীদ পরিবার সহ পুরো এলাকাকেই যেন মুহূর্তে ঘিরে ফেলে শোকের এই ঘনকালো অন্ধকার! শত শত মানুষের ঢল নামে ৪৩ ব্যাঙ্কসিয়া রোড, গ্রিনএকরে রশীদ ভুঁইয়ার বাড়িতে। লেবার অথবা লিবারেলের রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে উভয়পক্ষের নেতাকর্মীরা রশীদ পরিবারকে একটু সান্ত্বনা দিতে একত্র হয় সেখানে। ল্যাকেম্বার লেবার এমপি পদপ্রার্থী জিহাদ দিব উপস্থিত হন তাঁর বাবাকে নিয়ে; চোখের পানি ফেলেন রশীদ ভুঁইয়ার জ্যেষ্ঠ কন্যার জন্য পরওয়ারদেগারের কাছে দু' হাত তুলে। সন্তান হারানো এক পিতার কষ্ট যে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভেদাভেদকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে - সেটাই প্রমাণিত হয়েছে আজ এই বাড়িতে। দলমত নির্বিশেষে সবাই আজ প্রার্থনা করেছে ডানা ফাবিয়া ভূঁইয়ার পরপারের শান্তির জন্য; আর রশীদ পরিবারের সেই শোকভার বহনের ক্ষমতা লাভের জন্য। শোকাহত রশীদ ভূঁইয়ার পরিবারকে সমবেদনা জানাতে সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর কার্ল সালেহ, কাউন্সিলর মাইকেল হাওয়াত, হারুনুর রশীদ, ইমামুল হক, রিয়াদ মাহমুদ, গাজী কামরুল হুসাইন নীলু, অপু সরোয়ার, গাউসুল আলম শাহাজাদা, মনোয়ার মৃধা মুন্না, মেহেদী হাসান, জামিল হুসাইন, আবুল বাশার খান, এস আর খান, আনিসুর রহমান রিতু, নোমান শামীম, সুপ্রভাত সিডনির সম্পাদক পরাগ সাজ্জাদ, আলী সিকদার সহ আরও অনেকে। গত ১৫ মার্চ, ২০১৫ রবিবার ল্যাকেম্বা লিবারেল এমপি পদপ্রার্থী রশীদ ভূঁইয়ার জ্যেষ্ঠ কন্যা ডানা ফাবিয়া ভূঁইয়ার রূহের মাগফেরাতের জন্য বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। ৪৩ ব্যাঙ্কসিয়া রোড, গ্রিনএকরে রশীদ ভূঁইয়ার নিজ আবাসস্থলে এই বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। মাগরিবের নামাজের পর প্রায় দুইশত অতিথি ও রশীদ ভূঁইয়ার আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে এই বিশেষ দোয়া পরিচালিত হয়। মরহুমের রূহের মাগফেরাতের জন্য পবিত্র কুরআন তেলয়াত, কলেমা খতম ও বিভিন্ন সূরা পড়ে দোয়া পরিচালনার পূর্বে উপস্থিত মুসলিম অতিথিদের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদগণ তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর দোয়ার পর এশার নামাজের জামাতের শেষে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। এই বিশেষ দোয়ায় উপস্থিত ছিলেন শেখ শাহাবুদ্দিন, শেখ শামীমুল হক, ইমামুল হক, আব্দুল হেলাল উদ্দিন, মনোয়ার মৃধা মুন্না, শাহে জামান টিটু, গাজী কামরুল হুসাইন নীলু, অপু সরোয়ার, নোমান শামীম, মেহেদী হাসান, আলী হাসনাত শিমুল, রিয়াদ মাহমুদ, লিয়াকত আলী স্বপন, এস আর খান সহ কমিউনিটির আরও অনেক গণ্যমান্য।

‘চলো দ্বীন ইসলামের পথে’

শারমিনা পারভীন (পপি):

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নামে শুরু করছি। এই বিশেষ দিনটি ছিল শনিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫। প্রতি বছরের মতন এ বছরও আয়োজন করা হয়েছে একটি বিশেষ ইসলামিক দাওয়াতি সমাবেশের। আর এই দাওয়াতি সমাবেশের আহবান জানিয়েছে IPDC অর্থাৎ "ইসলামিক প্রাকটিস এন্ড দাওয়াহ সার্কেল" একটি ইসলামিক সংগঠন। এই দাওয়াতি সমাবেশের একটিই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আর তা হচ্ছে মানুষের সার্বিক জীবনে ইসলাম তথা মহান আল্লাহ রাব্বুল আল আমিনের দেয়া বিধানকে কার্যকর ভাবে প্রতিষ্ঠা এবং গ্রহণযোগ্য পন্থায় ইসলামের সৌন্দর্যকে এই অস্ট্রেলিয়ার বুকে যত মুসলমান ভাইবোন রয়েছে সকল পেশার মানুষজনের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন। তাই গত একটি সপ্তাহ ধরেই আমাদের কিছু দ্বীনি ভাই বোন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এই দ্বীনি দাওয়াতি সমাবেশটিকে অন্যান্য মুসলমান ভাই বোনের কাছে সঠিক ভাবে উপস্থাপন করার। বর্তমানে এই পৃথিবীতে মুসলমান হিসেবে নিজেদের অবস্থান কে মজবুত করে ধরে রাখতে হলে আমাদের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে নিজের পরিবার থেকে প্রথমে দ্বীনি দাওয়াতের কাজ শুরু করা আর আমাদের সন্তানরা হচ্ছে আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ। এইবারে আমরা দেখব IPDC কিভাবে অনন্য এবং আমাদের পরিবারে দ্বীনের আলো পৌঁছানোতে সহায়তা করে -১) মসজিদ - মাসালা থেকে ইসলামিক জ্ঞানের প্রশিক্ষণ, পবিত্র কোরআন, হাদিস নিয়ে আলোচনায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা ২) IPDC তে ভাইদের ইসলামিক জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি বোনদের এবং বাচ্চাদের পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ৩) বাচ্চাদের স্কুল হলিডেতে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন যেমন জ্ঞানের প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, পিকনিক, পুরস্কার বিতরণী ইত্যাদি। ৪) উন্নত মানের লাইব্রেরি IPDC -র অন্যতম আকর্ষণ যেখানে পবিত্র কোরআনের তাফসীর সহ অন্যান্য ইসলামিক বই পাওয়া যায়। IPDC -র দাওয়াতি সমাবেশ যেটা St.Marys মসজিদে অনুষ্ঠিত সেখানে পারস্পরিক টীম ওয়ার্ক লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি কাজে আমাদের ভাইবোন অক্লান্ত শ্রমের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন সুস্বাদু রান্না বান্না, আপ্যায়ন, সকলকে ঠিক ভাবে বসার ব্যবস্থা, বাচ্চাদের বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে ব্যস্ত রাখা ইত্যাদি।অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল পবিত্র কোরআন তেলোআত, উদ্বোধনি বক্তব্য, মসজিদের ইমামের দাওয়াতি কাজের উপর বিশেষ বক্তব্য, অডিও ভিডিও সমৃদ্ধ একটি ওয়ার্ক শপ ও ইসলামিক হামদ নাত।আনন্দ মুখর, পারস্পরিক পরিচিতির, দ্বীনি জ্ঞান পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সবাই উপভোগ করেন।আমার সবশেষে একটি বিশেষ হাদীস আমার প্রিয় পাঠক ভাই ও পাঠিকা বোনদের সাথে শেয়ার করতে চাই, হাদীসটি হলো: "হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদিস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছিয়েছেন।কেননা অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয়, সেই ব্যক্তি শ্রোতা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে। (তিরমিজি ওইবনে মাজহা) মহান আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন, দ্বীন ইসলামিক সঠিক দাওয়াতটি সঠিক ভাবে যেন আমরা একে অন্যকে পৌঁছাতে পারি, ওয়ালা তৌফিকি, ইল্লা বিল্লাহ।

২১ শে ফেব্রুয়ারি:

হ্যাপি রহমান

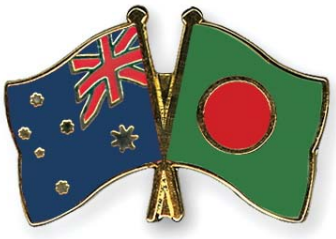

আগুন ঝরা দ্রোহ আর বাঙ্গালী সত্তার জাগরণে অমর একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে ২১ শে ফেব্রুয়ারি।বেদনার রঙে আঁকা বিবর্ণ সুখস্মৃতি।কালের বিবর্তনে এখন গোটা ফেব্রুয়ারি-ই যেন বাংলা ভাষার মাস।আত্মমর্যাদা বিকাশে চেতনা আন্দোলনের স্মারক। বাঙ্গালীর আমেরিকা ও ইউরোপ অভিবাসনের মতই ১৯৬২ সালে অস্ট্রেলিয়া অভিবাসনের শুরু। পর্যায়ক্রমে অভিবাসীদের সংখ্যার বৃদ্ধিতে প্রতিভাবানদের সারিও প্রসারিত হয়েছে।তারা জানতেন একটি জাতির ভাষার বিকাশ ঘটে চর্চা ও ব্যবহারের মাধ্যমে।প্রথমে ড্রয়িং রুম দিয়ে সাহিত্য চর্চা শুরু হলেও বিন্দু থেকে বৃত্তে রূপ দেয়ার প্রয়াসে একুশে একাডেমীর পথ চলা।প্রতি বছর ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিও পালন করে থাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

প্রতিবছরের মতো এবারও অ্যাশফিল্ড হেরিটেজ পার্কে উদযাপিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও বইমেলা।এ আয়োজনে অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মেয়র, এমপি, সিটি কাউন্সিলর, অস্ট্রেলিয়ার মূলধারার প্রধান রাজনৈতিক দুটি দল লেবার ও লিবারেল পার্টির কর্মী ও নেতৃবৃন্দ।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়ার কার্যকরী কমিটির সকল সদস্য, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশীগন। প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়া নিউ সাউথ ওয়েলস সংসদ সদস্য জুলিয়া অনস এদিন উপস্থিত থেকে ভাষা শহীদদের স্মরণে বক্তব্য রাখেন।

গত ২৮ তারিখ অস্ট্রেলিয়া সংসদ অধিবেশনে তিনি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের কথা উল্লেখ করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কথা তুলে ধরেন।এসময় তিনি ভাষা শহীদ সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন এবং তাঁদের অবদানের কথা তুলে ধরেন।এটি সমগ্র বাংলাদেশীদের জন্য গর্বের বিষয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন, অ্যাশফিল্ড পার্ক- সিডনী ২০১৫। ছবিঃ সুব্রত পাল

Robert Frost:

আমেরিকান কবি।

বিশ শতকে (১৮৭৪-১৯৬৩)

কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। আমেরিকার বিশিষ্ট সাহিত্য পুরষ্কার– পুলিৎজার পুরষ্কারে ভূষিত হন চারবার। 'The Road Not Taken' তার বহুল পঠিত এবং আলোচিত একটি কবিতা।

আমরা কোন পথে যাব তা স্থির করা একটি বড় ব্যাপার। সচরাচর সবাই যে পথে যায় সে পথে না গিয়ে অন্য পথ ধরেছিলেন কবি এবং তাতেই অনেক কিছু তফাত হয়ে গিয়েছিল।

কবিতা

হলুদ এক বনে দুটো রাস্তা গিয়েছিল দুদিকে বেকে
দু: খ হল আমি একা পথিক যেতে পারিনা দুপথেই
অনেক অনেকক্ষণ সেথা দেখলাম দাড়িয়ে থেকে
যত দূর দৃষ্টি যায় নিচে বুঝলাম তাতে দেখে
মিলে গিয়েছে তা নিচের ঝোপ-ঝাড়ের দিকেই।

অন্য পথই ধরলাম যেটিতে যাওয়া ঠিক মনে হল
মেনে নিলাম হয়ত দাবি তার বেশী ছিল সমীচীন
ঘাস- পাতা ঢাকা পথ ক্ষয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল
সম্ভবত আমার চলার ফলেই তাদের করে দিল
পদ চিহ্নে ক্ষয়ে দুটোকেই এক সমান মলিন।

সে সকালে পড়েছিল তারা একই রকম ভাবে
ঘাস ভরা পথে কোন পদ চিহ্ন ছিলনা সেখানে
মনে আশা রাখি আর কোন দিন যাওয়া যাবে
যদিও এক পথ মিশে যায় অন্য পথে কি ভাবে
সন্দেহ হল আর কি ফিরে আসা হবে এখানে।

অনেক দিন পরে হয়ত আমি বলব কাউকে
ছোট বড় শ্বাস ফেলে স্মরণে আসবে ক্ষণেক
এক বনে দুটি পথ গিয়েছিল বেকে দুই দিকে
আমি সেথা বেছে নিয়েছিলাম কম চলারটিকে
আর তাতেই ফারাক তখন হয়েছিল অনেক।

জীবন

ত. হ. সরকার

আশীতে দিচ্ছি কাশি, জানান দিচ্ছি বেচে আছি
তবে সময় শেষ, বুঝতে পারি বেশ।
জিভে জল আনা খাবার, মন চায়না আবার
গোধূলির অস্ত রাগে করেনা মন আনচান
দখিনা বাতাস আনে না
জীবন নিয়ে চিন্তা ভাবনা আসে
বেচে কি লাভ তাও মনে ভাসে
কোন এক জীবন
সে কি শুধু ঘুম খাওয়া আর রমণ
হাত ছানি দেয় মরণ, কেমন তার বরণ
স্মৃতি তার নেই কোন, তবু লব তারি শরণ।

নাতী

রফিক খান

নিষ্পাপ তুমি, প্রিয়জন তুমি
তুমি ভালোবাসার ফুল
দুচোখে তোমার আলোক ধারায়
পৃথিবী মশগুল।
কথা বলো না , শুধু চেয়ে থাকো
তবুও কত কথা যাও বলে
হৃদয়ে হৃদয়ে স্পন্দন তুলে।
চমকিত তুমি , বিকশিত তুমি
আমি আনন্দে ব্যাকুল।
ছিলে অচেনা ঐ অজানার দেশে
আমারে নিয়ে গেলে স্বপ্নের দেশে

মা জননী

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান খান

ভুবন জোড়া একটি নাম
একটি অক্ষর, বহু তার দাম
কোন মূল্য যায় না পাওয়া তারে ।
যে যতদিন বেশী পেয়েছে,
তার মাকে কাছে ।
দুনিয়ার ধনী সে, সেই ধনবান
ভুবন জোড়া একটি নাম ।
মায়ের আদর বুঝবে কে
যার মা নাই এই ধরাতে,
সেতো কাঙ্গাল, বড়ই কাঙ্গাল ।
স্বার্থহীন মা একটি অক্ষর
ভুবন জোড়া হাসি তার একটু খুশি ।
স্রষ্টার আরশ কেপে উঠে
মা কষ্ট পেয়ে যদি উহু করে কিছু বলে ।
থাকতে জীবন কর তারে সম্মান
পাবে তার প্রতিদান স্রষ্টার কাছে ।
হারালে মাকে তার, কাঁদবে জীবন ভর
পাবে না কভু তার সম আর, “মা” ।
একটা দেশ সবাই তাকে “মা-ই” ডাকে
সে কত উদার, চিন্তা কর হাজার বা
পাবে না খুঁজে তার ত্যাগের সম আর
পৃথিবী জুড়ে একটি নাম
একটি অক্ষর সীমাহীন তার দাম ।

প্রবাসীর ডায়রি

ডাঃ জেসমিন শফিক

দেখবো কি সেই রক্তরাঙা কৃষ্ণচূড়ার সারি?
হয়তো দেখবো না--শুনবো কি তরুণ-তরুণীর সেই উচ্ছ্বাসিত কলরব?
হয়তো শুনবো না--
জানবো কি এক নবীন শিক্ষার্থীর ভীরু মনের আশা?
হয়তো জানবো না--
ভুলবো কি আর্টস ফ্যাকাল্টির সেই সুউচ্চ দালান আর তার সামনে আমাদের গর্বের ' অপরাজেয় বাংলা' ?
কখনো কি ভুলবো কার্জন হল--
সেই গম্ভীর লাল রঙের রাজসিক প্রাসাদ--
আমার প্রয়াত বাবার গর্বের বিদ্যাপীঠ
আমার তরুণী মায়ের ঝলমলে পদক্ষেপে মুখরিত আঙ্গিনা
ভুলবো কি একটি ছোট্ট মেয়ের তার মামার হাত ধরে সলিমুল্লাহ হলের প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো অবাক মূর্তির --
তার বিস্মিত মনের ভাবনা "এর চেয়ে বড় অট্টালিকা পৃথিবীতে আর আছে কি?
কখনো কি ভুলবো তখনকার সেই ' আমি' র বন্ধুদের সাথে ছায়া সুনিবিড় পথে চঞ্চল যাওয়া আসা--সেই জনাকীর্ণ ঢাকা মেডিকেল
গেট
তার পাশেই বাংলার বিপ্লবী পাদপীঠ ‘ শহীদ মিনার’
যেখানে ছিল পাদচারণা দিন-রাত
ভুলবো কি বিরক্তিকর কোন মুহূর্তে -
সবুজ জারুল গাছে দেখে বেগুনি ফুল-হঠাৎ করেই মন ভালো হয়ে যাওয়া ভুলবো কি? ভোলা কি যায়?
সে যে রয়ে যায় মনের গহীনে
প্রতিদিন . . . বহুদিন. . . চিরদিন।

জাহানারা ইমাম

আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাহানারা ইমাম তখন ঢাকা শহরের সুচিত্রা সেন। সেকালে সেই পঞ্চাশের দশকে প্রতিটি মেয়েই সুচিত্রা সেন হইতে চাইতো। নায়িকা হিসেবে সুচিত্রা সেন তখন তার শিল্পী জীবনের শীর্ষে। বাঙালিরা তাদের আরাধ্য নারীর ভিতর যে দুর্লভ গুনগুলো খুঁজে বেড়ায় এবং ভবিষ্যতেও খুজবে বলে মনে হয় - সৌন্দর্যে, ব্যক্তিত্বে, পরিশীলনে এবং মাধুর্যে তিনি ছিলেন তার নিকটতম

উপমা। এখন চলচ্চিত্রের যুগ শেষ হয়ে টেলেভিশনের উত্তেজনামুখর ছোটো পর্দার ক্ষিপ্র, চটুল ও অপস্রিয়মান যুগের পদপাত ঘটেছে। এমন যুগে সারা জাতির শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় অভিষিক্ত, আরাধ্য ও অপ্রাপনীয় এমন সার্বজনীন পরমা খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না।

এমন পরিস্থিটিতে দেশের প্রতিটি মেয়ের সুচিত্রা সেন হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা থাকা অসম্ভব নয়। ছিলও তাই। তারা সুচিত্রা সেনের ঢঙে শাড়ী পড়ত, খোপা বাধত , মাথার মাঝ বরাবর সিথি করে চুলগুলোকে দুদিকে আলতো ভাবে উচিয়ে বিছিয়ে দিতো এবং তারই মত দৃপ্ত ঋজু বা ঈষৎ হেলিয়ে বিনীতা অপুরূপা হতে চাইতো। জাহানারা ইমামের সঙ্গে সেই সময়ের অন্য মেয়েদের পার্থক্য এই যে তারা সবাই সুচিত্রা সেন "হতে চেয়েছিল" আর জাহানারা ইমাম তা "হয়েছিলেন।"

প্রথমদিকে আমি জাহানারা ইমামকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কি করে কলকাতা থেকে এত দুরে , এই প্রত্যন্ত ঢাকা শহরে অবিকল একই চেহারার একজন সুচিত্রা সেন থাকতে পারেন, যিনি পর্দার অলীক নায়িকা নন , একজন বাস্তব মানুষ অথচ তারই মত হেঁটে ফিরে বেড়ান , হাসেন, কথা বলেন ! বাঙালিরা নানা জাতির সমাহার। একজনের সাথে আরেকজনের চেহারার মিল নেই। প্রত্যেকের ভিতরেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট আলাদা অংগ প্রত্যঙ্গে অমিলভাবে ছড়িয়ে আছে। আমার ধারণা আজ পৃথিবীতে যত জন বঙ্গভাষী আছে ততজন আলাদা চেহারার বাঙালি আছে। তবুও মাঝে মাঝেই বাঙালির সমিল অবয়ব আমাকে বিমুঢ় করে। আমি এ যাবত বাংলাদেশে অবিকল শেখ মুজিবের মত দেখতে অন্তত তিনজন মানুষ দেখেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখন এম. এ শেষ পর্বের ছাত্র তখন, উনিশশো ষাট - একষট্টির দিকে একদিন অবাক হয়ে দেখি , সেই সুচিত্রা সেন আমারই বিভাগে , বাংলায় এম. এ. প্রথম পর্বে এসে ভর্তি হয়েছেন। তিনি তখন সম্ভবত সিদ্ধেশ্বরীর কোনো মেয়ে স্কুল এর প্রধান শিক্ষিকা বা শিক্ষিকা। বি. এ. তিনি অনেক আগেই পাশ করেছিলেন , নানা কারনে এম. এ পড়াটা হয়ে ওঠেনি , এবারে হয়তো সেটা শেষ করে নিতে চান। সামনাসামনি একজন চলমান সুচিত্রা সেনকে রোজ রোজ দেখতে পাবার কথা ভেবে উৎসাহিত হলাম।

দিন কয়েক এর মধ্যে তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ এল। সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ছিল বর্তমান মেডিকেল কলেজের দক্ষিণ অংশ জুড়ে, যার পুবধারের বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ছোট্ট অফিস এখন হাসপাতালের জরুরি বিভাগ - রক্তাক্ত রোগীদের যন্ত্রণা আর কাতরক্তির অবিশ্রাম আর্তনাদমুখর চৌহদ্দি। আর আমাদের এই শ্রেণী কক্ষ গুলো , যেখানে আমাদের তরুণ বয়সের স্বপ্নরা এক এক করে পাপড়ি মেলেছিল সেগুলো এখন দুঃস্বপ্নগ্রস্ত রোগীদের ম্রিয়মাণ ওয়ার্ড। আর কলাভবনের আঙ্গিনার মাঝখানটার যে আমতলা থেকে একদিন ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষার যে আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল সেই আমগাছের চিহ্ন আজ কোথাও নেই। বাংলা বিভাগের পাঠকক্ষের বারান্দা দিয়ে আমরা জন তিনেক ছাত্র হেটে যাচ্ছিলাম, তার সঙ্গে দেখা হতেই কথা শুরু হলো। তার ফুটফুটে সুন্দর জীবন্ত ত্বক তখনও তার অবয়ব জুড়ে বিভা ছড়াচ্ছে। আমাদের দলের একজন তার পরিচিত ছিল, তাকে দেখে নিজে থেকেই কথা শুরু করলেন তিনি। এক দুইবার আমিও কথাবার্তায় যোগ দিলাম।

সব মানুষের জীবনে বিশেষ করে তরুণ বয়সে এমন একটা সময় যায় যখন নিজের মুখটা উচু করে বাল্বের মতো উচু করে তুলে ধরার সাধ জাগে। নিজেকে সবার সামনে পরিচিত প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত দেখার ইচ্ছায় হৃদয় অসহায় হয়। সবাই আমার দিকে একটু তাকাক , আমাকে দেখুক , চোখে সপ্রশংস বিস্ময় ফুটিয়ে এক আধটু উচ্ছসিত হোক , এমনি একটি আকাঙ্ক্ষা ভেতরে ভেতরে আকুলি বিকুলি করে। আমার মনে হয় কেবল ঐ বয়সে নয় , সব বয়সেই মানুষের ভেতর কাজ করে ব্যপারটা , জীবনের সাফল্যের মাত্রার সঙ্গে বয়সের বিভিন্ন পর্বে এর চরিত্র আর আচরণের পার্থক্য হয়। আমি তখন অপরিচিত মফস্বল থেকে আসা নাম - পরিচয়হীন তরুণ , আমার ভেতর এই উৎসাহ এক-আধটু বাড়াবাড়ির পর্যায়েই হয়তো ছিল। মাঝেমধ্যে নিজেকে একটু রঙ চড়িয়ে তুলে ধরার ইচ্ছা নিজের অজান্তে সহনীয় মাত্রা ছড়াতো। এ নিয়ে কে কি বলছে বা ভাবছে তা নিজেকে বুঝতে দিলেও বোকামী, ভেতরের আকাঙ্ক্ষাটাকে তাহলে পুরোপুরি তুলে ধরা যাবে না।

তার সামনে নিজেকে কেউকেটা প্রমাণ করার সাধ বোধহয় একটু বেশি মাত্রাতেই পেয়ে বসেছিল। ঠিক মনে নেই কথায় কথায় কি একটা ব্যপারে যেন একটা জাকালো মন্তব্য করে বসেছিলাম। আমার এই

ছোট্ট নিরপরাধ কথাটা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার জন্য যে কতোটা দুর্ভাগ্য বয়ে আনতে যাচ্ছে ভাবতে পারিনি, আমার কথা মাটিতে পড়ল না , প্রায় সম্পূর্ণ কারনহীন ভাবে ফেটে পড়লেন তিনি, তার চেহারা পাল্টে গেল, মুখ নির্মম হয়ে উঠলো, আমার উক্তিটিকে তিনি নির্মম চাবুকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। যেন তার উপর অনুষ্ঠিত কোনো জগৎ -ব্যপী অন্যায়ের সহিংস প্রতুত্তর দিচ্ছেন তিনি। তার চোখ থেকে উত্তপ্ত আগুনের তীব্র আগ্নেয় হল্কা আমি বেরিয়ে আসতে দেখলাম।

আমি বুঝলাম না যে আমার অপরাধ ঠিক কী। আমি কি না জেনে তার জীবনের কোনো অসহায় জায়গায় অযাচিত আঘাত করেছি? সে যাই হোক, তার সেইদিনকার সেই নির্মমতা আমার কাছে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয়নি। বরং স্নায়ুর উত্তেজনা ঘটিত এক ধরনের নিয়ন্ত্রনহীন অসুস্থ মানসিক অবস্থা বলেই মনে হয়েছিল। রাগলে কাউকেই সুন্দর দেখায় না, এমন কি সুচিত্রা সেন দেরও নয়। ওটা হতে পারে মঞ্চের নাটকে, যেখানে ক্রোধকে মাধুরী দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। বাস্তব জীবনের রাগ সব সময়ই দৃষ্টি কটু। আমাদের ঢাকার সুচিত্রা সেন কেও সেদিন আমার চোখে সুন্দর মনে হয়নি। তার কণ্ঠস্বর শুনে প্রথমেই কিছুটা হতাশ হয়েছিলাম। তার সেই ক্রোধ আমার সেই হতাশাকে আরও বেশি প্রকট করে দিলো।আগেই বলেছি আমি তখন মফস্বল শহর থেকে আসা নিতান্ত গোবেচারা তরুণ। একটি স্ত্রীবর্জিত পৃথিবীতে আমাদের শৈশব কেটেছে। সুন্দরী অত্যধিক মহিলা দুরের কথা, সাধারণ আটপৌরে মহিলা দেখার সুযোগও আমাদের প্রায় ছিল না। নারী মাত্রই আমাদের কাছে তখনও দেবী। সুন্দরী নারী দেখার যা একটু আধটু সুযোগ ছিল তা শুধু সিনেমার পর্দায়। কিন্তু সেই স্বপ্ন জগতে তো সব কিছুই ঘটতে পারে। সেই জগত অবাস্তব। রাগও সেইখানে সৌন্দর্যময় ও অনবদ্য। কিন্তু বাস্তব সুন্দরী তাই বলে এতো ক্ষমাহীন, এত নির্মম হবে? আত্ম-অবমাননার কষ্ট আমার ভেতরটাকে ক্ষতবিক্ষত আর অবসন্ন করে তুলল। নারীর সৌন্দর্য আমাকে ভীতিগ্রস্ত করে দিলো। সেই মানসিক বৈকল্য কাটাতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। আমার ছেলে বেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমি আমার চারপাশে এমন প্রতিভাবান মহিলা কমই দেখেছি যারা মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ। এমন অবিবেকী, হৃদয়হীন আর অত্যাচারী এই সমাজ, এমন নিষ্ঠুর আর বর্বরোচিত যে, মহিলা দুরের কথা প্রতিভাবান পুরুষের পক্ষেও এই সমাজে মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা কঠিন। প্রতিভাবান মানুষদের চৈতন্য জগত এমনতেই সাধারণ মানুষদের চেয়ে দীপ্র ও দ্যুতিময়। তাদের অনুভূতি ও স্পর্শকাতরতা তুলনামূলক ভাবে প্রখর ও তীক্ষ্ন। অল্প আঘাতে এরা ছিড়ে যায়।তাদের ইচ্ছা ও স্বপ্ন প্রাপ্য ও প্রাপ্তি সাধারণ মানুষ থেকে বিপুলভাবে আলাদা। এই পৃথিবী পাল্টে যারা নতুন পৃথিবী তৈরী করবে, ভিন্ন পথে মোড় ফেরাবে ধরেই নেয়া উচিত তাদের চাওয়া পাওয়া ক্রোধ আক্রোশ ঠিক চারপাশের দশটা গড়পড়তা মানুষের মতো হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সামাজিক হিতের নামে এই মূঢ় স্থূল সাধারণ মানুষগুলো কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এইসব অনুভূতি সম্পন্ন ও স্পর্শকাতর মানুষদের ওপর এমন অমানবিক অত্যাচার চালায়, নিজেদের সাধারণত্বের স্থূল রোলারের নিচে তাদের পিষে ফেলার জন্যে এমন নিষ্কৃতিহীন ও পাশবিক চাপ দিতে থাকে যে তারা ধীরে ধীরে মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। প্রতিভাবান মানুষেরা এমনিতেই কিছুটা তেড়িয়া। তারা যুদ্ধপ্রিয় ও কলহপরায়ণ। উন্নততর কিছু সৃষ্টি করতে চায় বলেই এরা চারপাশের বিবেকহীনতা এবং অন্যায়ের সঙ্গে সারাক্ষণ যুদ্ধ করে। কিন্তু আমাদের সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্থূল ও অকর্ষিত আক্রমণ এই অদমিত মানুষদের ক্রমাগতভাবে রক্তাক্ত ও ক্ষত বিক্ষত করতে থাকে। পুরুষেরা তবু তাদের শক্তিশালী সামাজিক অবয়বের কারণে এই হামলার সামনে কোনোমতে মানসিক ভারসাম্য জিইয়ে রাখতে পারলেও মহিলারা প্রায়শই ভেঙ্গে পড়ে। আজও এই সমাজে সন্মানজনক মানুষ হিসেবে একজন নারীর সত্যিকার অবস্থা নেই। আদর্শ নারীর গুণপনা বলতে গিয়ে মহাভারতে কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামাকে দ্রৌপদী বলেছিলেন আদর্শ স্ত্রী শুতে যাবে সবার শেষে, উঠবে সবার আগে। অর্থাৎ সমাজ সংসারের জন্য নিজের সুখ শান্তি অকাতরে উৎসর্গ করাই হবে তার জীবনের লক্ষ্য। নারী জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে এই সব ধারণা আজও অবিকল একই রকম।আজও এ সমাজে একজন নারীর কোনো সামাজিক মর্যাদা নেই, যেমন তার শ্রম জীবনপাতের অর্থনৈতিক মূল্য বা স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথের ' নিষ্কৃতি' কবিতার গৃহবধূর মতোই ' রাধার পরে খাওয়া' আর ' খাওয়ার পরে রাধার' অর্থহীন জীবনচক্রের ভিতরেই সে শেষ হয়। আজও আমাদের সমাজের একজন মেয়ে, সে যত বড় বা বৈভবশালী পরিবারের সন্তান হোক, যখন স্বামীর ঘরে ঢোকে, তখন দাসী হয়েই ঢোকে। সামাজিক ভাবে পুরাপুরি অস্তিত্বহীন অবস্থাহীন এই পরিবেশে অনুভূতি সম্পন্ন, স্পর্শকাতর বা প্রতিভাবান হওয়া কিংবা এই সমাজের ভুল ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন তোলা একজন নারীর অমার্জনীয় ধৃষ্টতার পর্যায়ে পড়ে। সমস্ত মধ্যযুগের ইউরোপে এইসব প্রতিভাময়ী নারীদের ডাইনী আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা প্রতিভার অপরাধে খনার জিভ কেটে নিয়ে বা গার্গীর মতো মাথা খসে পড়ার ত্রাসের নীচে তাদের দমিত করে রেখেছে। আমাদের সমাজে যে মেয়ে কোনো অতিরিক্ত সম্পন্নতা বা শক্তি নিয়ে জন্মায়, প্রতিভার শাস্তি হিসেবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর যে পরিমাণ সামাজিক আক্রমণ চলে তা তাকে এক সময় সারা পৃথিবীর ওপর বিদ্বেষপরায়ণ, ক্ষিপ্ত এবং অসহিষ্ণু করে তোলে। তার স্বাভাবিক সহনশীলতা ও মানসিক সুস্থিরতা নিজের অজান্তেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সব কিছুর ওপর অকারণে সে সারাক্ষণ ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে এবং তার ওপরে অনুষ্ঠিত বিশ্বজনীন নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নিজের অজ্ঞাতে শত্রু মিত্র সবার ওপর অকারণে ও নির্মম ভাবে আক্রমণ

চালাতে থাকে। এদের মধ্যে যারা জীবনের শেষ অব্দী সাফল্যের মুখ দেখার সৌভাগ্য পায় তাদের ভেতরকার এই অদমিত ক্রোধ, প্রাপ্তিজনিত পরিতৃপ্তির কারণে, এক সময় কিছুটা নমনীয় হয়ে আসে। কিন্তু যাদের জীবনে এই আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য জোটে না বা অন্যায্যরকমে কম জোটে (নানান গ্রহণযোগ্য কারণে অমনটা ঘটতে পারে) তারা এক আক্রোশ তিক্ত । পৃথিবীর ভিতর সবার বিরক্তি এবং বৈরিতা ঘটিয়ে অসুস্থভাবে জীবন শেষ করে। আমার ধারণা জাহানারা ইমামের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে আমাকে যে আক্রোশের স্বীকার হতে হয়েছিল তা আমাদের দেশের মহিলাদের ওপর অনুষ্ঠিত সমাজ ও পরিপার্শ্বের যৌক্তিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন ও অসমযুদ্ধরত এক প্রতিভাময়ী নারীর স্বাভাবিক তিক্ত প্রতিক্রিয়া। আট - নয় বছর পর তার সঙ্গে আমার আবার পরিচয় হয় তখন তার ভেতর ওই তিক্ততা আমি দেখিনি। তিনি তীব্র ও নিরাপোষ ছিলেন কিন্তু কোনমতেই অপ্রীতিকর ছিলেন না। বরং ছিলেন উল্টো। আতিথ্যে ও অন্তরঙ্গতায় সবাইকে তিনি তার উত্তাপ মধুর মানবিক সান্নিধ্যে টেনে নিতেন। আট - নয় বছরে তার এই পরিবর্তনের একটা কারণ অনুমান করা অসম্ভব নয়। ওই সময়ের মধ্যে তিনি নানা দিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। নানান ধরনের সাফল্য তার জীবনকে মঞ্জরিত করেছিল। জীবনের পথে এগোবার সঙ্গে সঙ্গে মনের সুস্থিরতা ও সাফল্যের স্বস্তি ততদিনে তার ভেতরকার সেই ক্রোধ এবং তিক্ততাকে উন্নীত করেছে এক ধরনের আপোষহীন ভারসাম্যময় তেজস্বিতায়। গত কয়েক বছরে সারা জাতির হৃদয়ে আবহমান বাঙালীর বিলীয়মান চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রজ্বলিত করার এবং বিস্মৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে ফিরিয়ে দেবার সংগ্রামে তিনি যে অনমনীয়, শক্তিশালী ও নির্ভীক নেতৃত্ব দিয়েছেন, একালের মৌলবাদীরা সেই নেতৃত্বের ভেতর তার সুসংহত ও লক্ষ্যভেদী তেজস্বিতাকে এক অমোঘ মরনাস্ত্ররূপে অনুভব করেছে। উনিশ শতকের বাঙালিরা মানুষের ভেতরকার এই 'তেজস্বিতা' ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। ওই কালটাই ছিল এক বিপুল সংখ্যক শক্তিমান মানুষ আর তাদের অভাবনীয় কর্ম উদ্যোগের যুগ। অমানুষিক সংগ্রাম আর সাধনার পথেই একেকজন মানুষ সে সময় সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতেন। এজন্যে কীর্তিমান মানুষদের জীবনকালে বা মৃত্যুর পর তাদের নিয়ে জীবনী লেখার উৎসব পড়ে যেত। জীবনীকারেরাও তাদের বিভিন্ন গুণপনার উল্লেখ প্রসঙ্গে যে -গুনটির কথা সবচেয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেন তা হচ্ছে 'তেজস্বিতা' একজন শক্তিমান মানুষের ব্যক্তিতে। এই তেজস্বিতার উপস্থিতিকে তখন অনিবার্য মনে করা হতো। দুঃসাধ্যের অনিশ্চিত যাত্রায় যিনি নিঃসঙ্গ সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন, তেজস্বিতার বিরল পাথেয় ছাড়া তিনি কিভাবে তা পারবেন, ওই যুগ জাতির ভুয়ীষ্ঠ সম্ভাবনায় বিশ্বাস করত, আস্থা রাখত ব্যক্তি চারিত্রিক দার্ঢে। কিন্তু আমাদের কালে চারপাশের নির্বিকার লুণ্ঠন আর নৈতিকতার দুরপনেয় পতন দেখে সব ব্যাপারে আমরা সংশয়ী ও নেতিবাদী হয়ে পড়েছি। আমাদের হাড় গুড়িয়ে গেছে। আমাদের চারপাশে তেজস্বী বা শক্তিমান মানুষের আজও অভাব নেই। কিন্তু অবিশ্বাস-দ্বিখন্ডিত আমরা তাদের শ্রেয়ত্তকে শ্রদ্ধা জানাতে অপারগ হচ্ছি।

২. জাহানারা ইমামের সংগে আমার পরবর্তী যোগাযোগ বছর সাতেক পরে, তার নিজের উৎসাহেই। ততদিনে আমাকে তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। মনে থাকা সম্ভবও নয়। কবে কোন পাঠকক্ষের বারান্দায় কোন অপরিচিত ছাত্রকে তিনি হঠাৎ রাগের মাথায় কি বলেছিলেন, তা কদিনই বা মনে রাখা যায়। খুব সম্ভব উনিশশো আটষট্টি সাল সেটা। টেলিভিশনে অনুষ্ঠান উপস্থাপনার বছর-দেড়েক পার হয়েছে আমার। আমার অনুষ্ঠান ততদিনে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে। একদিন স্কুটার চালিয়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা ভোক্স ওয়াগন গাড়ি আমাকে পার হয়ে রাস্তার বা দিক চেপে আমার পথ আটকে দাঁড়াল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে গাড়ির ভিতরে তাকালাম; দেখলাম, স্টিয়ারিং-এ বসে আছেন আমাদের সুচিত্রা সেন- সেই আগের মত রমণীয় আর অনিন্দ্য। সংগে তার দুই স্কুল-পড় ছেলে-রুমী আর জামী। সে সময়কার ছোট্ট জনবিরল ঢাকা শহরে যে হাতে গোনা দু একজন মহিলা গাড়ি চালাতেন তিনি তাদের একজন। তার সংগে প্রথম পরিচয়ের রূঢ় আঘাতের ক্ষত অনেকদিন পর্যন্ত আমাকে ক্ষুব্ধ করে রেখেছিল, তাকে দেখতেই অমি আমার ভেতরে সেই পুরানো বিবমিষার প্রত্যাবর্তন অনুভব করলাম। কিন্তু তার হস্যোজ্জ্বল মুখ স্নিগ্ধ সকালের মত স্নিগ্ধতা মাখানো। মনে হল আজকের এই মানুষটি নির্মল আকাশের মত, সেদিন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা তাকে যেমন ভাবতে ভালবাসতাম, ঠিক তেমনি। একটু অবাকই হলাম। আমাকে তিনি চিনলেন কি করে? কিছুতেই মনে থাকার তো কথা নয়। চকিতে একবার টেলিভিশনের কথা মনে হল। অসম্ভব নয়। দর্শকদের উৎসাহ নামে একটা ব্যাপারের সংগে অমি বেশ পরিচিত। আমি থামতেই তিনি হাসি মুখে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। সহজ স্বরে বললেন, 'একটু অভদ্রতা করলাম। আমার দু ই ছেলে আপনার দারুণ ফ্যান। আপনাকে দেখে গাড়ির ভেতরে হৈচৈ লাগিয়ে দিল' বলে দুই ছেলের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন।

চলবে...

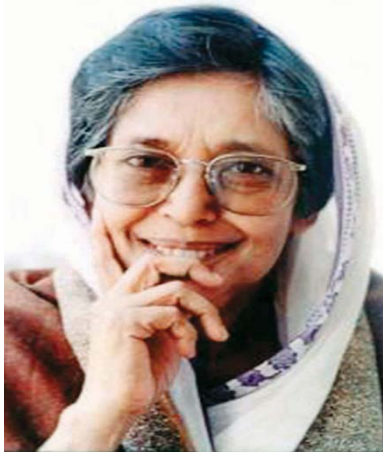

আমার জীবনের প্রথম চলচিত্র দর্শন

ইমতিয়াজ কায়েস রিশা

আমার জীবনের প্রথম চলচিত্র দর্শন "সুয়োরানী /দুয়োরানী" টাঙ্গাইলের রওশন টকিজ হলে ছোট ফুফুর সাথে। বিশাল হলঘর। বাতি নিভিয়ে দেয়া হলো। যতদুর মনে পড়ে বাতি নেভানোর সাথে সাথে আমার ছেলেমানুষী অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। কিছুক্ষণ সিনেমা চলার পর হঠাত করে পর্দা জুড়ে' হাও মাও খাও মানুষের গন্ধ পাও' বলতে থাকা একদল রাক্ষস খোক্ষস- আমার তখন আত্মারামের খাঁচা ছাড়ার অবস্থা। তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিলাম। ভেস্তে গেল ফুফু এবং তার বান্ধবীর সুওরানী দুওরানী দর্শন। মাঠে মারা গেল টিকিটের পয়সা। এরপর অনেক দিন রুপালি পর্দার ধরে কাছে যাইনি। কয়েক বছর পর পাড়ায় ঈদ এ রাজকীয় স্টাইল এ উদ্বোধন হলো 'রূপসী' হলের। ক্লাস থ্রী ফোরে পড়ি। উদ্বোধনী ছবি' জীবন নিয়ে চলছে জুয়া। সামাজিক ছবি- মানে অ্যাকশন ট্যাকশন নাই। বাসায় মায়ের কড়া ধর্ম -কর্মের জন্য টেলিভিসন নেই- মানে কোনরকম বিনোদনের ব্যবস্থ্যা নেই। দুই ভাই যুক্তি করলাম ঈদ এর দিন ম্যাটিনি শো মারতে হবে। অনেক সাহস করে দুরু দুরু বুকে ব্ল্যাকারের কাছ থেকে বেশি দামে দুইটা স্টলের টিকেট কিনলাম। ছবিটার পাত্র পাত্রীর কথা ভুলে গেছি- গল্পও মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে নাচ গানের সময় পাশে বসা দর্শকেরা বাঁদরের মত চিৎকার করছিল আর শিস বাজাচ্ছিল। অবাক হয়েছিলাম খুব। নাচ গানের সময় পাগলের মত আচরণ করার কি আছে বুঝতে পারিনি। তবে বাসায় না বলে সিনেমা দেখে খুব মজা পেয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে সিনেমার নেশায় পড়ে গেলাম। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে, পুরনো সংবাদপত্র কিলোদরে বিক্রি করে, কিংবা অনন্যোপায় হয়ে বাবার পকেট কেটে এমনকি বাজারের পয়সা সরিয়ে হলেও সিনেমা দেখা অব্যাহত থাকলো। দেখা হয়ে গেল সমাধি, তাজ তলোয়ার, নিশান, নওজ ওয়ান, মিন্টু আমার নাম, দোস্ত দুশমন, আসামী, আসামী হাজির, বদলা, বেদ্বীন, মতিমহল, সুজন সখী, বাহাদুর, মোকাবেলা, রাজ দুলারী আরো অনেক অনেক সিনেমা। রূপসী, রওশন, কেয়া, মালঞ্চ এবং রুপবাণী- টাঙ্গাইলের এই পাচ হলে সপ্তাহে অন্তত একটা করে সিনেমা দেখা হত। মাঝে মাঝে স্কুল পালিয়েও সিনেমা দেখতে চলে যেতাম। বাবা মার কাছে মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যে উত্তম মধ্যম হজম করেছি তার স্মৃতিচারণ করলে এখনো হাড়- মাংসের স্নায়ুতে টান পড়ে। নেশার টান হচ্ছে হ্যাচকা টান- শাসন টাসনের ধার ধারেনা। নতুন ছবির বিজ্ঞাপনী ব্যান্ড পার্টি যখন রঙিন পোস্টারের কাফেলা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে এবং মাইকে সুর করে ঘোসনা দেয়' র- ও- শ- ন হলে আ- সি- তে- ছে, নাচে গানে ভরপুর মার মার কাট কাট অ্যাকশন- আংশিক রঙিন ছবি আসামী হাজির'। এহেন আমন্ত্রণ অবহেলা করার মতন প্রাণশক্তি তখনও আমাদের রপ্ত হয়নি। আমার হলে গিয়ে বাংলা সিনেমা দেখার নেশার টান শেষ হলো ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হবার পর। হঠাত করে কি জানি কি হলো রাজ্জাক, শাবানা, ববিতা, সোহেল রানা, ওয়াসিম, জসিম আর আকর্ষণ করলো না। ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হবার কয়েকদিনের মধ্যেই অডিটোরিয়াম এর প্রজেক্টর এ দেখালো সত্যজিত রায়ের তিন কন্যা। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ছোট গল্প পোস্ট মাস্টার, মনিহারা এবং সমাপ্তি নিয়ে বানানো তিনটা স্বল্প দৈর্ঘ্য ছবি নিয়ে একটি সিনেমা। তিন কন্যা দেখে আমি খুব অবাক হলাম। নাচ নেই গান নেই, ঢিসুম ঢিসুম ফাইটিং নেই, শেষ দৃশ্যে নায়কের জয় জয়কার নেই। চিৎকার চেচামেচি নেই- একেবারে নিরামিষ যাকে বলে। কোনো এক রহস্যময় কারণে ছবিটা আমার ভালো লেগে গেল। এত ভালো লাগলো যে ছুটিতে বাড়ি এসে রূপসী রওশনের চকমকি পোস্টার ব্যানার আমাকে আর কাছে টানলো না। সত্যজিতের তিন কন্যার প্রেমে পরে গেলাম এবং ঢাকাইয়া ফিল্মের সাথে আমার চিরস্থায়ী ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় রাশেদের (এ সময়ে বাংলাদেশের স্বনামধন্য তরুণ সিনেমাটোগ্রাফার) সাথে সত্যজিত চর্চা করেছি প্রচুর। সত্যজিতের প্রায় সব ছবিই দেখা

Medical Centre in Lakemba

Medical Centre in Lakemba urgently requires GP doctors (VR or non-VR) to start ASAP full time or part time.

Contact H Khan on Mobile: 0405 305 024 or E-mail: hiks250@gmail.com for more information.

হয়েছে একাধিক বার করে। সবচে বেশি বার দেখেছি পথের পাঁচালি। মনে আছে একবার টিভির ব্রাইটনেস শুন্য করে দিয়ে পথের পাঁচালি শুধু শুনলাম। সংলাপ খুব কম। কালজয়ী এই ছবিটির আবহ সঙ্গীত করেছেন রবিশংকর। সেতার, সরোদ, বাঁশি, বেহালার যন্ত্রসজ্জায় পথের পাঁচালির আবহ সঙ্গীত হয়ে উঠেছে সংগ্রহ-যোগ্য ক্লাসিক অ্যালবাম। ছবিটির প্রতিটি সিকুএন্স এর ফ্রেম খেয়াল করলে দেখা যাবে ডিটেল এর ছড়াছড়ি। পুরো ছবিটার কোথাও কোনো অবাস্তব মনে হয়নি। মনে হয়েছে গ্রামীন কোনো পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলো কেউ একটা লুকানো ক্যামেরা দিয়ে তুলে রেখেছে। ছবিটাতে আমার কিছু প্রিয় মুহূর্ত আছে। যেমন ছেঁড়া কাঁথার ফুটোর ভেতর দিয়ে বালক অপুর চোখ খোলার দৃশ্য। সুদর্শন ডাগর একটা চোখ - যেন দারিদ্রেরভেতর থেকে বেরিয়ে আসা একটি সম্ভাবনা। একই ধরনের একটা সিকুএন্স আছে অপুর সংসারে। নববধু অপর্ণার পটলচেরা চোখ দেখা যাচ্ছে অপুর দরিদ্র ঘরের জানালার ছেড়া পর্দার ফুটোপথে। পরের দৃশ্যেই দেখা গেল জানালার পর্দারপরিবর্তন - নতুন ফুল আঁকা পর্দা ঝুলছে জানালায়। জানালার মত অপুর জীবনও হয়ে উঠলো ফুলেল এবং রঙিন। অপুর সংসারে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে একটা মজার ব্যাপার আছে। অপু যখন কলকাতা থেকে খুলনা যায় - নৌকা ভ্রমনের অংশটুকুতে আবহ সঙ্গীত হিসেবে বাঁশির সুরে বেজে উঠে ' আমার সোনার বাংলা' । বাংলাদেশের জন্মের দশ বছর আগের এই ছবিটিতে পূর্ব বাংলার দৃশ্যে ' আমার সোনার বাংলা' বেজে ওঠা নিঃসন্দেহে কাকতালীয়। পরবর্তিতে বাউল সুর প্রভাবিত এই রবীন্দ্র সঙ্গীতটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনে অপুর সংসার কোনো রকম প্রভাব ফেলেনি তাও নিশ্চিত করে বলা যাবেনা।

পঞ্চাশ ষাটের দশকে নববিবাহিত দম্পতির ঘনিষ্টতা রুপালি পর্দায় দেখানো কষ্টকর ছিল। খোলামেলা দৃশ্য কল্পনাই করা যেত না। সত্যজিত অপুর সংসারে এই ঘনিষ্টতা দেখালেন দারুন কৌশলে। ভোর বেলায় অপর্ণা বিছানা থেকেউঠতে যেতেই আচলে টান পড়ল। দেখা গেল অচল বেঁধে রাখা হয়েছে বিছানার সাথে। অপর্ণার ঠোঁটে মুখে হাসি ফুটে উঠলো। কিছুক্ষণ পর ঘুম ভাঙ্গা অপুর হাতে স্ত্রীর চুলের ক্লিপ - মুখে তৃপ্তির হাসি। সিগারেটের প্যাকেট খুলতে গিয়ে অপু দেখে প্যাকেটের ভেতরে অপর্ণার গোটা গোটা হাতের লেখায় লেখা ' কথা দিয়েছ দিনে একটার বেশি খাবে না' । পুরো ব্যাপারটাতে তথাকথিত অশ্লীলতার আশ্রয় না নিয়ে স্বামী স্ত্রীর ঘনিষ্টতা দেখানো হয়েছে - ভালবাসা দেখানোহয়েছে. সত্যজিতের এমন মুন্সিয়ানা প্রথম দিকের প্রায় প্রতিটা ছবিতেই রয়েছে। চারুলতায় যেমন চারুলতা দোলনায় দোলে - পৃথিবীও দুলতে থাকে চারুলতার চোখে। দুলতে থাকা পৃথিবী দেখানোর জন্য ক্যামেরাটাকেই দোলনায়দুলিয়েছেন সত্যজিত। পথের পাঁচালির ইন্দির ঠাকরনের নিজের কণ্ঠে গাওয়া ' হরি দিনতো গেল সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে' লালন শিষ্য কাঙ্গাল হরিনাথের লেখা কালজয়ী একটি গান। গানটির ব্যবহার আরো কলিজাস্পর্শী হয়ে উঠেযখন ইন্দির ঠাকরনের মৃত্যুর পর আবার ধীর লয়ে বেজে ওঠে।

সত্যজিত ছাড়াও অপর্ণা সেন, তারেক মাসুদ, বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত, মৃনাল সেন, গৌতম ঘোষ, ঋতুপর্ণ ঘোষ, মীরা নায়ার, শ্যাম বেনেগাল, আব্বাস কিয়ারুস্তামি, রিচার্ড লিংকলেটার আমার পছন্দের পরিচালক। তালিকাটা অবশ্য আরোঅনেক দীর্ঘ। এদের সবার সম্পর্কেই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা এরকম করে লেখা যাবে নিঃসন্দেহে।

লেখক-ব্লগার অভিজিৎ রায়কে হত্যা:

বই মেলার শেষের দিকে ২৬ ফেব্রুয়ারী, দুর্বৃত্তরা অভিজিৎ রায়কে পেছন থেকে চাপাতি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে। তার অপরাধ তিনি ‘কুসংস্কারও মৌলবাদ’ এর বিরুদ্ধে লিখতেন। তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৭ সালে জাহানারা ইমাম পদক পায় তার সংগঠন মুক্তমনা ব্লগ। বইমেলার আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে রত বাহিনীর লোকদের উপস্থিততেই এমন ঘটনা ঘটে গেল। ঠিক একই ভাবে ২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী বই মেলা থেকে ফেরার পথে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছিলেন ড: হুমায়ূন আজাদ। বোঝা যায় কেউ মুক্ত চিন্তা করলে, লিখলে তার ওপর হামলা হবে। অভিজিৎ রায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের সাবেক অধ্যাপক অজয় রায়ের পুত্র। তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ছিলেন। তার প্রকাশিত বইগুলি ছিল- আলো হাতে চলিয়াছে আধারের যাত্রী, মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোজে, স্বতন্ত্র ভাবনা, মুক্ত চিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি, বিশ্বাসের ভাইরাস।

দুর্বৃত্তদের হামলার সময় অভিজিৎ এর সংগে তার স্ত্রী রাফিদা আহমেদ ছিলেন। তারা বই মেলা থেকে বেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি এস সি সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের প্রবেশ পথের কাছে চা এর দোকানে যাচ্ছিলেন। দুই যুবক অতর্কিতে চাপাতি দিয়ে পেছন থেকে অভিজিৎকে কোপাতে থাকে। এ সময় রাফেদা তাকে রক্ষা করতে গেলে দুর্বৃত্তরা তাকেও কোপ দেয়। কয়েকজন ফটো-সাংবাদিক রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। মাথায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান । তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৪২ বছর।

সিডনীতে অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও স্মরণ সভা: হ্যাপি রহমান

মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা, লেখক ও প্রকৌশলী অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও স্মরণ সভার আয়োজন করেন ক্ষুব্ধ-বিহ্বল শোকার্ত সিডনি প্রবাসী বাঙ্গালীদের একাংশ। গতকাল (০৩. ০৩. ২০১৫ ইং) সন্ধ্যা ৬টায় সিডনির বাণিজ্যিক এলাকা মার্টিন প্লেসের লিন্ট চকলেট ক্যাফের সামনে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক ও নাট্য পরিচালক আকিদুল ইসলাম, মুর্তালা রামাত, অজয় দাস গুপ্ত, তরুণ অভিনেত্রী রুপন্তি আকিদ, নাট্য প্রযোজক আবেদা রুচি, নোমান শামীম, ধ্রুপদী আকিদ, টেরেসা দীপ্তি, রামিম মিথুন, সুমিত মণ্ডল, সহ আরও অনেকে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, সব কিছু ছাপিয়ে কর্মব্যস্ততার প্রাচীর তাদের বাঁধা হতে পারেনি। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সিডনি শহরের দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই আসতে পারেননি। নাট্যকার আকিদুল ইসলাম অত্যন্ত সাবলীল চমৎকারভাবে পুরো স্মরণ সভার সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি বলেন, সরকারি দল-বিরোধী দল, আস্তিক-নাস্তিক, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী বুঝি না। আমরা সাধারণ জনগণ শুধু বুঝি মানবতার ধর্ম মানুষের ধর্ম। সভায় অন্যান্য বক্তারাও একই মত প্রকাশ করেন। বই মেলার কঠোর নিরাপত্তা বেস্টনী ভেদ করে জন সম্মুখে একজন লেখককে হত্যার দায় সরকার, রাষ্ট্র সর্বোপরি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এড়াতে পারেনা। অংশগ্রহণকারী সকলেই অবিলম্বে অভিজিৎ হত্যাকারী ও তাঁর স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যাকে কুপিয়ে জখমকারীদের দৃষ্টান্ত মুলুক শাস্তির দাবি জানান। সেই সঙ্গে উগ্র জঙ্গি-মৌলবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। প্রগতি চিন্তার বধ্যভূমি নয়, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ধর্মের দোহাই দিয়ে হানাহানি বন্ধ করে সুন্দর সুস্থ সুনিশ্চিত আবাসন হবে প্রিয় জন্মভূমি। সবশেষে, টেরেসা দীপ্তির নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠে সকলে গেয়ে উঠেন "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে" গানটি।

ট্যালেন্ট ডে, ২০১৫:

গত ২২ ফেব্রুয়ারী হ্যাসেল গ্রোভ কমিউনিটি সেন্টারে বাংলাদেশ ফোরাম ফর কমিউনিটি এনগেজমেন্ট যে সমস্ত ছেলে মেয়ে অপরচুনিটি ক্লাসে সুযোগ পেয়ে সিলেকটিভ স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে এবং H.S.C তে ভাল ফল করেছে তাদের জন্য এক সম্বর্ধনার আয়োজন করে। এই সম্বর্ধনা পূর্বে বাংলাদেশ ফোরাম ফর কমিউনিটি এনগেজমেন্ট করলেও এখন তা ডা: আব্দুল হক ও তার পরিবার অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্বাবধান করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ডা: আব্দুল হক, ডা: আয়াজ চৌধুরী ও আরও অনেকে। বাচ্চাদের ক্রেস্ট প্রদান করে স্বীকৃতি-দান এবং উৎসাহিত করা হয়।

অভিভাবকগনের সাথে ট্যালেন্টবৃন্দ

Curry Belly
Indian Restaurant

195 Rocky Point Rd, Ramsgate
Tel: 9529 8821
www.currybelly.com.au

"Think, Feel, Eat @ Curry Belly"

- Authentic Indian cuisine
- Catering for **Bangladeshi** functions
- Best price guaranteed. Value for money.
- 60 seat dine-in capacity. Ideal for small occasions.

"Our pricing and overall strategy will be designed around your requirements and to your own satisfaction. Curry Belly caters for all occasions and with its professional and skilled team will ensure that the Customer is King"

ওয়েস্টমিডে ভারতীয় মহিলা খুন:

গত ৭মার্চ শনিবার রাতে প্রভা অরুন (৪১) নামের এক ভারতীয় মহিলা ওয়েস্টমিডে তার বাসার কাছে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। প্রভা ওয়েস্টমিড রেল স্টেশন থেকে হেটে তার বাসায় আসছিলেন। বাসা থেকে যখন তিনি মাত্র ২০০মিটার দূরে তখন এক দূর্বত্ত তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। মহিলা তখন ফোনে তার স্বামীর সাথে কথা বলছিলেন, তাকে আঘাতের কথা বলেন। তার এক প্রতিবেশী তার চীৎকার শুনে সেখানে আসেন। এম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। জানা যায়, প্রভা অরুণ একজন শান্ত শিষ্ট মহিলা। তিনি এখানে আই টি চাকুরী করে দেশে স্বামী ও তার মেয়ের কাছে টাকা পাঠাতেন। আগামী জুনে তার ভিসার মেয়াদ শেষ হলে তিনি দেশে ফিরে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। পুলিশ ছয় মাস আগে ওয়েস্টমিডে ছয় সেক্স ভয়োলেন্স ঘটনার সাথে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে কি না সে সম্বন্ধে তদন্ত করছে।

মমতা ব্যানার্জির মমতাময় বাংলাদেশ সফর:

গেল মাসে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিন দিনের বাংলাদেশ সফর শেষ করে গেলেন। অনেক ভালো ভালো আশার কথা শুনালেন। বললেন পশ্চিম বাংলার কাছে বাংলাদেশের প্রত্যাশা পূরণে তিনি যথাসাধ্য করবেন। বাংলাদেশের সাথে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হবে। কলকাতায় ‘ বঙ্গবন্ধু ভবন’ নির্মাণ করবেন। তিস্তার পানি বণ্টন ও স্থল সীমান্ত চুক্তি বিল সংসদে পাশ নিয়েও আশার কথা ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশের ইলিশ মাছ নিয়ে কথা হয়েছে। ইলিশ মাছের বিভিন্ন পদ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কে ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। ভোজ বৈঠকে তিনি আশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশে থেকে আরও বেশী ইলিশ মাছ পশ্চিম বাংলায় যাবে। উত্তরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন- পানি এলে মাছ যাবে। খুব সুন্দর কথা, বাংলাদেশের মানুষও তাই আশা করে।

গেল ৯ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে বৈঠক কালে তিস্তা- চুক্তি স্বাক্ষরে তার পাশে থাকার কথা বলেছেন মমতা ব্যানার্জি। বাংলাদেশের সাথে স্থল সীমান্ত চুক্তি সংক্রান্ত বিল যাতে সংসদে দ্রুত পাশ করা যায় তার জন্য সব রকম সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। ভারতের কেন্দ্র সরকার চাইছে, চলতি বাজেট সেশনেই সংসদের দুই কক্ষে বিলটি পাস করিয়ে নিতে। তা সম্ভব হলেই এপ্রিলে মোদী বাংলাদেশে যেতে চান, সংগে মমতাকেও নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি। বাংলাদেশের সাথে দীর্ঘ দিন ঝুলে থাকা চুক্তিটি স্বাক্ষরে তৃণমূলের সমর্থন কেন্দ্রের বাংলাদেশ নীতিকে শক্তিশালী করবে বলে তিনি মত পোষণ করেন।

২০১১সালে এই চুক্তিগুলি স্বাক্ষরে কিন্তু মমতা ব্যানার্জির অন্য রকম ভূমিকা দেখা যায়। সে সময় ড: মনোমোহন সিং মমতাকে নিয়ে বাংলাদেশে এসে চুক্তি স্বাক্ষরের সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মমতা ব্যানার্জি আপত্তি জানালেন, চুক্তিতে দেয় পানি তার রাজ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে। তিনি সফরকারী দল থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

চিকিৎসা নিয়ে কথা বার্তা:

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় হেপাটাইটিস A... এর সংক্রমন ঘটেছে সন্দেহ করে স্বাস্থ্য বিভাগ চীনে প্যাকেট করা Nana`s (frozen) ১কে জি রাস্পবেরী (গায়ে ১৫. ০৯. ১৬ পর্যন্ত ভাল লেখা) ও Creative Gourmet Mixed Berries (frozen) 300gm (B.before 10.12.17), 500gm (B. before 6.10.17) প্যাককে দায়ী মনে করছে। নিচের লেখাটি হেপাটাইটিসকে জানার জন্য দেয়া হয়েছে। হেপাটাইটিস লিভারের একটি অসুখ। লিভার বা কলিজা আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই অঙ্গ কাজ করা বন্ধ করলে আমরা দু একদিন বেচে থাকতে পারি। বলা হয়, লিভার ফেইল করল তো শরীর ফেইল করল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় লিভার ৭৫% অসুস্থ হলেও এটা কাজ করতে পারে। কারণ অবশিষ্ট ভাল কোষগুলো নতুন লিভার টিসু তৈরি করতে সক্ষম। লিভার একটা গাড়ির ইনজিনের মত অনেক কাজ করে, নিশ্চিত করে শরীরের সব কিছু যেন ঠিকঠাক মত চলে। লিভারের কাজ হল:

ভিটামিন, চিনি, আয়রন জমা করা- যেন শরীর শক্তি পায়।

- কলোস্টরেল উৎপাদন ও এর নিষ্কাশনের নিয়ন্ত্রণ করা ।
- শরীর থেকে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, ড্রাগ ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ দূর করা।
- রক্ত- ক্লট ফল সৃষ্টি করা, যাতে কেটে গেলে বা আঘাত পেলে বেশী রক্ত ক্ষরণ না হয়।
- রোগপ্রতিরোধ শক্তি বাড়ান এবং রক্ত প্রবাহকে ব্যাকটেরিয়া মুক্ত রাখা, যেন ইনফেকশন না হয়।
- খাদ্য পরিপাক ও পুষ্টিযুক্ত পদার্থ শোষণের জন্য ‘ বাইল (bille) ক্ষরণ করা

হেপাটাইটিস লিভারের প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন সৃষ্টি করে। এর জন্য যে রোগ লক্ষণ সমূহ দেখা যায় তা হলো- গায়ের ত্বক এবং চোখ হলুদ হওয়া, বমি বমি ভাব, জ্বর, ও ক্লান্তি বোধ করা। কতিপয় ভাইরাসের আক্রমনের কারণে লিভারের প্রদাহ হয়। এগুলোর নাম ইংরেজি অক্ষর A B C D E দ্বারা করা হয়েছে।

হেপাটাইটিস A: খাবার এবং পনিয় দ্বারা ছড়ায়। দু তিন সপ্তাহ লক্ষণ গুলো থাকে তারপর এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। বিশেষ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। তবুও এর থেকে মুক্ত থাকতে ভালভাবে হাত ধোওয়া, বাথরুম পরিষ্কার রাখা, পানি ফুটিয়ে খাওয়া প্রয়োজন। নিরাপদ HAV ভাকসিন আছে। এই ভাইরাসে একবার আক্রান্ত হলে আর আক্রমণের সম্ভাবনা নেই।

হেপাটাইটিস B: আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে, তার রক্ত বা ইনজেকশন সূচ দ্বারা সংক্রমণ হয়; যৌন সংসর্গ দ্বারাও এই হেপাটাইটিস বিস্তার লাভ করে। গর্ভবতী মা তার সন্তানের মধ্যে এর ভাইরাস দিয়ে দিতে পারে। পেট ব্যথা করে, ক্ষুধা কম লাগে। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমুহে এই ভাইরাসের আক্রমণ বেশী দেখা যায়। বেশির ভাগ বয়স্ক লোকই আপনা আপনিই সুস্থ হয়, আর কোন সমস্যা থাকেনা কিন্তু বাচ্চারা এই ভাইরাসের আক্রমণ সহজে কাটিয়ে উঠতে পারেনা, পরবর্তী জীবনে তার লিভার সমস্যা দেখা দিতে পারে। ক্রনিক হেপাটাইটিস- বি লিভারের জটিল সমস্যা তৈরি করতে পারে, এমন কি এর থেকে লিভার ক্যানসারও হতে পরে। এই প্রকার হেপাটাইটিসেরও নিরাপদ HVB টীকা আছে।

হেপাটাইটিস C: অধিকাংশ লোক এই ভাইরাসের আক্রমণ কাটিয়ে উঠতে পারে না, জীবনভর ভুগতে থাকে। জটিল লিভার সমস্যা দেখা দেয়, সমস্যা লিভার সিরোসিসে রূপ নেয়।এর কোন নিরাপদ টীকাও নেই।

হেপাটাইটিস D: সাধারণত কম দেখা যায়, যাদের ইতোমধ্যে B এর আক্রমণ হয়ে গেছে তাদেরই হতে পারে। HBV টীকা নেয়া যেতে পারে।

হেপাটাইটিস E: এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেখা যায়, গর্ভবতী মেয়েদের বেশী হয়। পানি বাহিত ভাইরাস। এরও কোন টীকা নেই।

এই লেখা যখন লিখছি তখন দেশ থেকে আমার মামা এলেন। তার কাছে খবর পেলাম, তার ছেলের জন্ডিস হয়েছে। তিনি বললেন, খুব করে আখের রস খেতে দিলাম আর পাড়ায় ফকিরের কাছে নিলাম। সে জন্ডিসের চিকিৎসা করে। একটা সুতার মালা মাথা গলিয়ে গলায় পরাতে দিলেন। সেটি মাথা দিয়ে গলায় এল না। ফকির বলল, ঝেড়ে দিলাম, মালাটি এক সপ্তাহের মধ্যে মাথা গলিয়ে যখন গলায় আসবে তখন বোঝা যাবে জন্ডিস ভাল হয়েছে। আজব চিকিৎসা! বুঝলাম সে হেপাটাইটিস- A তে আক্রান্ত; বিশ্রাম নিলে সে তাড়াতাড়িই সুস্থ হয়ে উঠবে।

লুঙ্গি–স্পঞ্জ সমাচার:

বাংলাদেশে নিম্নবিত্ত মানুষেরা লুঙ্গি পরে। মধ্যবিত্তদেরও কেউ কেউ লুঙ্গি পরেন। উচ্চবিত্তেরা পরেননা তো বটেই, নাক সিটকান। একটা আনস্মার্ট পোশাক, পরার যোগ্য নয়। এই আনস্মার্ট পোশাকের সুবিধা কিন্তু অনেক। সবচেয়ে বড় সুবিধা এটা বানাতে কোন দরজি লাগেনা। এটা অনেকটা শাড়ীর মত সবার জন্য এক মাপ। চিকন- মোটা, লম্বা- বেটে সবাই একই লুঙ্গি পরতে পারেন। ইচ্ছামত উপরে নিচে নামান যায়, বাথরুম করতে বোতাম খোলা বা জিপার টানতে হয়না। হাত মুখ মোছার কাজে সুন্দর ব্যবহার করা যায়। তারপরেও কেন লুঙ্গিকে নিয়ে এত নিম্ন মানের কথাবার্তা! যেমন- এক তরুনী তার বান্ধবীকে বলছে- ছেলেটির (এর সাথে তার বিয়ের কথা হচ্ছে) সব ভালো, দেখতে ভাল, বংশ ভাল, উচ্চশিক্ষিত কিন্তু তার বাবা লুঙ্গি পরেন।

বান্ধবী: তাতে কি হল, ছেলে ত পড়েনা?

তরুণী: আরে না, শ্বশুর সাহেব অফিস থেকে এসে লুঙ্গি পরে বারান্দায় বসে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে গা চুলকাচ্ছে, ভাবতেই কেমন লাগে। দেখলে না ফিট হয়ে যাই।

মনে হয় তরুণীটির লুঙ্গি ছাড়াও গা চুলকানোতে আপত্তি আছে। ফিটের ব্যারামও থাকতে পারে। গা চুলকান স্বাভাবিক ব্যাপার। তাতে আপত্তি! তার উপর লুঙ্গি পরে, ডবল আপত্তি।

পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। লুঙ্গি নিয়ে তার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। তার কনে স্বাতীর পরিবারে কি করে খবর গেল সুনীল লুঙ্গি পরেন। লুঙ্গি পরা যুবকের সাথে বিয়েতে পরিবারের দ্বিধা। সুনীলকে বলতে হল তারা ভুল শুনেছেন। তিনি লুঙ্গি পরেন না তবে তার বাবা লুঙ্গি পরতেন। তবে আমার মনে হয় সুনীল যদি বলতেন, ‘ আমি লুঙ্গি পরিনা, কিন্তু যদি পরতাম তাহলে স্বাতী তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে না?’ আমি খুশী হতাম। আমি নিজে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একজন ভক্ত পাঠক।

লুঙ্গি পরা বার্মিস তরুণী

আমার ছেলেবেলার বন্ধু আবুল বলে- লুঙ্গির বেজায় সুবিধা, কাছা দিয়ে চট করে গাছে ওঠন যায়, মারামারি করা যায়। আবার কাছা খুলে দিলেই ভদ্রলোক। তবে অসুবিধাও আছে। আবুল গ্রামের এক ছোট মাস্তান। লুঙ্গি বিষয়ে আমার কৌতূহল থাকায় বললাম- অসুবিধাটা কি? "জব্বর অসুবিধা। সেদিন মকবুলেরে পাড়ায়ে ফেলেছিলাম। ব্যাটা আমার বোনেরে খারাপ কথা কয়। ব্যাটারে সাইজ করে দিতাম, কিন্তু সে শা... আমার লুঙ্গি ধরা দিল জোরে টান। লুঙ্গি সামলাতে গিয়া হাত থাকা ছুটা গেল।" সেদিন সিডনিতে এক মজলিশে একজন বললেন, এখানে ত কাউকে লুঙ্গি পরতে দেখিনা, পরলে বোধ হয় খারাপ দেখায়। মনে মনে বললাম লুঙ্গি খারাপ দেখায়, আর সর্টস পরে গেঞ্জি গায়ে খুব ভাল দেখায়! আমার মেয়েও লুঙ্গি পরে গেস্টের সামনে যেতে বা রাস্তায় বেরুতে নিষেধ করে। লুঙ্গির ওপর অনেকেরই অযথা নিষেধাজ্ঞা। অথচ জানেন, মিয়ানমারের জাতীয় পোশাক লুঙ্গি। আন সান সুচি যা পরেন তা লুঙ্গিরই নামান্তর। টি ভি তে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্র রাজা পাক্ষ্ সকে লুঙ্গি পরে, গলায় মাফলার পেঁচিয়ে দেখে আমার কাজের মেয়েটি তো বলে উঠল, হেই ব্যাটা ক্যাডা; লুঙ্গি পইড়া গলায় মাফলার দিয়ে টি ভি- ত আইছোন। তার ধারনা, তাদের মত গরীব- গুর্বো লোকই শুধু লুঙ্গি পরে। যুক্তিহীন ধারণা। ১৯৫৪ এ যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী (নামটা ঠিক মনে পড়ছে না) লুঙ্গি পড়ে জনসমক্ষে আসতেন। শুনেছি এক রাষ্ট্রদূত (সম্ভবত হুমায়ূন কবির) লুঙ্গি পরে অফিস করতেন। যাকগে, ফাও পেঁচাল শুনে চটবেন না। একটা গল্প শুনুন , আবুলেরই গল্প। সে তার মামাকে স্টেশন থেকে আনতে গেছে। মামা শহরে থেকে কলেজে পড়ে। প্যান্ট, সার্ট জুতা পরা স্মার্ট তরুণ। পথে পরল এক খাল। খালের উপরের বাঁশের সেতু, কিন্তু ভাঙা। সেতুর উপর দিয়ে পার হওয়া অসম্ভব। আবুল লুঙ্গি উপরে তুলে খালে নেমে পরল। পানি যত বাড়ে আবুলের লুঙ্গিও তত উপরে ওঠে। লুঙ্গি গলা পর্যন্ত উঠে নামতে শুরু করল। সে লুঙ্গি না ভিজিয়েই পার হয়ে গেল। স্মার্ট তরুণ লুঙ্গি পরে না। এখন উপায় ! বাকীটা আবুলের মুখেই শুনুন। "মামারে কেমনে আনি। মাথায় বুদ্দি আইল, গাছের আড়ালে গিয়া, গায়ের জামা খুইলা, লুঙ্গির মত প্যাচাইয়া, লুঙ্গিটা ঢিল মাইরা মামারে দিলাম। মামা আমার মত করে খাল পার হইল। কিন্তু পার হইয়া কয় কি, লুঙ্গিটায় বড় গন্ধ!" বুঝলাম শরৎচন্দ্রে ইন্দ্রের নতুনদারা সব খানেই এক- 'র্যাপারের গন্ধে ভুত পালায়,' কিন্তু গায়ে না দিয়ে উপাই কি? শীত যে বড় বেশী। পাঠক, লুঙ্গি নিয়ে রিসার্চ করেছি। কিন্তু একে না পরার কোন জোরালো কারণ পাইনি। আপনারা পেলে একটু জানাবেন, প্লিজ।

"এবারে স্পঞ্জের কথা কিছু করিব বর্ণন, গুণীজন সবে শোনেন দিয়া মন।" স্পঞ্জও নিম্নবিত্তের পাদুকা। ঢাকা শহরে ভোর বেলায় দেখা যায় দল বেধে মেয়েরা চলছে। প্রায় সবারই হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি, পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। গারমেন্টএ কাজ করতে যাচ্ছে এরা সবাই, হাতের বাটিতে লাঞ্চ। গারমেন্টের মেয়েরা পরে বলেই বোধ হয় অনেকেই একে তুচ্ছ করা দৃষ্টিতে দেখে। এই মেয়েরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে, দেশে ফরেন কারেন্সি আনার কাজ। অথচ সমাজ তাদের স্পঞ্জের স্যান্ডেলের মতই দেখে। আমরা এই স্যান্ডেলকে বড় জোর বাথরুমে ব্যবহার করতে পারি, বাড়ির বাইরে নয়। ছুটির দিনে বাজারে যাওয়াও যায়, মাছের বাজারে কাদা- পানি থাকে। নামাজ পরতে পায়ে দিয়ে মসজিদেও যাওয়া চলে। মসজিদে জুতা চুরি গেলে অল্পের উপর দিয়ে রেহাই মেলে। আমার কলেজের লাইব্রেরিয়ান সাহেবান মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন, পাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। মেয়ে একটু কেমন কেমন করে, মাকে বলে- উনি স্পঞ্জ পায়ে দিয়ে মসজিদে যান। আমি বলি, মেয়েকে মসজিদে স্পঞ্জ পরার শানে নজুল ব্যাখ্যা করুন, দেখবেন আপত্তি ঠিক হয়ে গেছে। এর কিছুদিন পর তার মেয়ের বিয়ের দাওয়াত খেয়ে এলাম। অনেক আগে(৫০- ৬০বছর) বাজারে কেবল স্পঞ্জ এসেছে। অল্প দাম, বেজায় কাজের। কাদা পানিতে যথেচ্ছা ব্যবহার করা যায়। তখন স্পঞ্জ বেশ নরম ছিল, পায়ে দিয়ে বেশ আরাম এবং সহজে ছিড়েনা। এখনকার স্পঞ্জ অবশ্য শক্ত, তাড়f তাড়ি ছিঁড়েও যায়। দাম কম বলে এখনও স্পঞ্জ রাজত্ব করে চলছে। তবুও জাতে উঠতে পারেনি।

মহেন্দ্র রাজা পাক্ষসে

সুবচনের প্রকাশনা উৎসব:

গেল ৬ ফেব্রুয়ারী পন্ডস কমিউনিটি হাব এ সুবচনের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সাহিত্য নির্ভর ম্যাগাজিনটি জানুয়ারী, ২০১৫ প্রথম প্রকাশিত হয়। যার উৎসাহ, উদ্দীপনায় সুবচনের এর প্রকাশ ঘটে তিনি সিডনি প্রবাসী ডা: তামান্না পারভীন। তার পিতা প্রফেসর তোফাজ্জল হোসেন সরকার, তার ছেলে মেয়ে- ফারদিন ফেরদৌস অভ্র, মিথিলা জাহিন ও সারিতা আলম- এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল সুবচন। প্রফেসর সরকার সিডনি ভ্রমণে এলে তার কন্যা, নাতি-নাতনি সবাই মিলে ঠিক করেন এমন একটা পত্রিকা বের করতে যা সিডনির প্রবাসী বাঙ্গালীদের মনের খোরাক জোগাবে, বাংলায় একটা পাঠযোগ্য পুস্তিকা তারা পাবেন। মনে হয় তারা এ প্রচেষ্টায় সফল, সুবচনের প্রকাশিত দুটি সংখ্যাই বাংলা পাঠকদের সমাদর পেয়েছে।

প্রকাশনা উৎসবে অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; তাদের অনেকেই বক্তৃতায় সুবচনের দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন, ছোট ছেলে মেয়েদের নাচ-গান উপভোগ করেছেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল সুবচনের সম্পাদক ডা: তামান্না পারভীন ও তার ছেলে ফারদিন ফেরদৌস করা ‘ মায়ে’ র গান। এই গানের সময় অনেককে চোখের জল ফেলতে দেখা যায়। নৈশ ভোজের মাধ্যমে এই সুন্দর অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

নোবেল জয়ী ইউনুস প্রবর্তিত সামাজিক ব্যবসা কেন্দ্র উদ্বোধন:

হ্যাপি রহমান

নিজস্ব কর্ম উদ্দীপনা এবং বৈশ্বিক বলয়ে ডঃ ইউনুস নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন অনন্য উচ্চতায়।এই নোবেল বিজয়ী মানুষটির স্বপ্নের নৌকা ক্ষুদ্র ঋণের ঘাট থেকে জাহাজ ভিড়িয়েছেন সামাজিক ব্যবসার বন্দরে, এখানে তার সাথে সাওয়ার হয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান।সম্প্রতিকালে এই প্রথমবারের মত অস্ট্রেলিয়া ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলসে নোবেল জয়ী ইউনুস প্রবর্তিত সামাজিক ব্যবসা কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে।এ উপলক্ষে গত ২০শে মার্চ The John Niland Scientia Building (Tyree Room), UNSW Kensington Campus, Sydney তে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।সামাজিক সমস্যা নির্মূলের জন্য সামাজিক ব্যবসা প্রবর্তন-এর ধারনা সামনে রেখে কাজ করবে এই নব গঠিত নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনুস সোশাল বিজনেস হেলথ হাব।এসময় উপস্থিত ছিলেন Mr. Michael Doyle, Mr. P.S. Chunnu, Ms. Keilly, Professor C.Raina Macintyre, Professor Siaw-Teng Liaw, UNSW Vice President Mr. Peter Noble, Professor Peter Smith, Dean, UNSW Medicine, Professor Pradeep Roy, Dr.Bayzidur Rahman, Dr. Md .Mahfuz Ashraf, Dr.Faiz Shah, Director Asian Institute of Technology, Thailand. এবং অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সংবাদকর্মীসহ অন্যান্য কমিউনিটির সদস্যরা। উপস্থিত বক্তারা বলেন,

১।ব্যবসার উদ্দেশ্য হবে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোতে জনসচেতনতা

প্রকাশনা উৎসব - সুবচনের সম্পাদক গণ

ড; ইউনুস এর সামাজিক ব্যবসার আলোচনায় স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ

তৈরি।বিশেষত যেগুলো ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ঝুঁকি তৈরি করে। যেমনঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও পরিবেশগত খাতে বিরাজমান সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত মুনাফাহীন কল্যাণকর ব্যবসা।
২। প্রকল্প অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হতে হবে।
৩। বিনিয়োগকৃত লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সম্প্রসারণে ব্যবহার হবে।
৪।পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প হবে।
৫। কর্মরত শ্রমিকদের কর্মস্থল হবে স্বাস্থ্যসম্মত, উন্নত ও ঝুঁকিমুক্ত।
৬। সকলের সক্ষমতা অর্জন করা- ই এ ব্যবসার লক্ষ্য।
৭।সামাজিক ব্যবসা হবে আনন্দের সাথে ব্যবসা।
অনুষ্ঠানে পাঠানো এক ভিডিও চিত্রে ডঃ ইউনুস বলেন, উন্নত দেশগুলোতেও স্বাস্থ্য বীমা দিন দিন ব্যয়বহুল হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা অনেকের কাছে লাভজনক ব্যবসা। অন্যদিকে বিনামূল্যে সেবা দেওয়ার ও ব্যবস্থা আছে। সেক্ষেত্রে কাউকে কাউকে অর্থের চাপ নিতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবসাকে তিনি সমস্যা সমাধানের উপায় বলে মনে করেন।ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য দক্ষতা কাজে লাগাতে হবে। তবে, উদ্দেশ্য হবে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের।

খেলা ধুলা:

আই সি সি ওয়ার্লড কাপ- ২০১৫: বাংলাদেশ সেমিতে ওঠতে ব্যর্থ- অনেক আশা জাগিয়েও বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সেমি ফাইনালে ওঠতে পারলনা। ভারতের কাছে ১০৯ রানে হেরে গিয়ে ওয়ার্লড কাপ থেকে বিদায় নিল। ওয়ার্ল্ড কাপ ২০১৫ ক্রিকেটে বাংলাদেশ দলের পারফরমেন্স নিয়ে লিখেছেন-

ওমর খালিদ রুমি (প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার, নির্বাচক ও ম্যানেজার বাংলাদেশ দল)

এবারে ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশ দলের ওআর্ম আপ match গুলোতে পারফরমেন্স দেখে অনেকেই বিভিন্ন রকম নেতিবাচক উক্তি ও মন্তব্য করেছেন প্রথমে। অবশ্য কারণ যে ছিল না তা নয়। কারণ ছিল এই রকম যে বাংলাদেশ দল প্রতিটি খেলায় হেরেছে। এমনকি অ্যাসোসিয়েট দেশ আয়ারলান্ডের বিরুদ্ধেও হেরে যাওয়াতে সবাই মর্মাহত হয়েছেন এই ভেবে যে ওয়ার্ল্ড কাপের মূল খেলাগুলোতে তাহলে কি একই অবস্থা হবে? সবার মন্তব্য ও ধারনাকে ভুল প্রমাণিত করে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ দল আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে এসেছে। প্রথম বারের মত। গত ৯ই মার্চের খেলাটিতে বাংলাদেশের ছেলেরা অবিশ্বাস্য ভাবে ইংল্যান্ড কে হারানোয় এখন আবার সবার মধ্যে নতুন আশাও সঞ্চারিত হয়েছে। বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত কি সব বাধা পেরিয়ে আরো ওপরে যেতে পারবে? একেবারে সেমি ফাইনাল ও ফাইনাল পর্যন্ত? প্রথম খেলা ছিল 'এ' গ্রুপের অন্য দল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। আফগানিস্তান অত্যন্ত শক্তিশালী একটা দল। এর মধ্যেই সেটা প্রমাণ করে ছেড়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় পেয়ে। এবারে তাই সবার মধ্যেই একটা শঙ্কা ছিল কে জানে আফগানিস্তান আবারও কোনও একটা অঘটন না ঘটিয়ে বসে। কিন্তু এবারে সেটা আর হতে দিলো না বাংলাদেশের ছেলেরা।

ক্যানবেরার সাবলীল পীচে প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ ২৬৭ রানের টার্গেট আফগানিস্তানকে দিয়ে দেয়। কিন্তু আফগানিস্তান শেষ পর্যন্ত মাত্র ১৬২ রানেই তাদের ইনিংস শেষ করে।

এনামুল হক ও তামিম ইকবাল ইনিংস শুরু করে। তামিম ১৯ রানে ফিরে গেলেও সৌম্য সরকার এসে হাল ধরে। ১০২ রানে ৩ ও ১১৯ রানে ৪ উইকেট পড়ে গেলে বাংলাদেশ কিছুটা চাপের মুখে পড়ে। কিন্তু মাহমুদুল্লাহ, সাকিব এবং মুশফিক হাল ধরলে ২৩৩ রানের পার্টনারশীপ তৈরী হয়। সাকিব ও মুশফিক আউট হলে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ২৬৭ রানে ইনিংস শেষ করে। সৌম্য সরকার ২৮, মাহমুদুল্লাহ ২৩, সাকিব ৬৩ ও মুশফিক সর্বচ্চো ৭১ রান করেন। প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ ২৬৭ রানের টার্গেট আফগানিস্তানকে দিয়ে দেয়। কিন্তু আফগানিস্তান শেষ পর্যন্ত মাত্র ১৬২ রানেই তাদের ইনিংস শেষ করে। সাকিব ও মুশফিকের অনবদ্য ব্যাটিংয়েই শেষ পর্যন্ত দলের স্কোর সন্মানজনক পর্যায়ে পৌঁছে। আফগানিস্তানের সপুর জাদরান, আফতাব, হাসান ও আশরাফ দুটি করে উইকেট পান। আফগানিস্তান ব্যাটিং করতে নেমেই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়। মাত্র ৩ রানে ৩ উইকেট পড়ে যায়। মাশরাফী ও রুবেল দুর্দান্ত বোলিং করেন। আফগানিস্তানের শেনোওয়ারী ও নবী এই দুই ব্যাটস ম্যান মাঝখানে এসে হাল ধরলেও এদের অন্তর্ধানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইনিংস গুটিয়ে যায় ১৬২ রানে।

সাকিবও ভালো বল করে দুটি উইকেট দখল করেন। ক্যানবেরার স্টেডিয়ামে ভরপুর বাঙালী দর্শকরা সেদিন আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেন। গ্রুপের খেলা গুলোর মধ্যে এই ম্যাচ টি বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করে। ব্যাটিং ও বোলিং এই

দুই ডিপার্টমেন্ট এই ছেলেরা উৎসাহ ব্যঞ্জক দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। পরের খেলাটি ছিল ব্রিসবেন এ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে খেলাটি পন্ড হয়ে যায়। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী দুই দলের মধ্যে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়ে যায়। তাতে বাংলাদেশ দল একটি পয়েন্ট একটি পেয়ে যায়। পরের ম্যাচ স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে।

স্কটল্যান্ডের দেয়া ৩১৮ রানের টার্গেট তাড়া করে বাংলাদেশ ৪ উইকেটে হারিয়ে ৩২২ রান করে। তামিম ৯৫, সাকিব ৫২, মাহমদুল্লা ৬২, মুশফিক ৬০ রান করে। পরের ম্যাচটি এডিলেডে ছিল। ইংল্যান্ডের দলের জন্য ছিল একটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ম্যাচ। এই ম্যাচে ওদের হার হলে ইংল্যান্ড গ্রুপ থেকে বিদায় নিবে। সেটাই ছিল সমীকরণ। অপরদিকে বাংলাদেশের জয় হলে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে।

ইংল্যান্ড সেদিন টসে জয় পেয়ে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত প্রায় কার্যকরী ভূমিকা নেয়ার মতো হয়ে যায় যখন আমাদের দুজন ওপেনারই প্যাভিলিয়নে ফিরে যায় অত্যন্ত কম রানে। ইমরুল কায়েস এবং তামিম ইকবাল মাত্র ১০ রানের মাথায় ফিরে গেলে বাংলাদেশের জন্য বিপদ ঘনিয়ে আসে। আন্ডারসন দুইটি উইকেটই পেয়ে যান। সৌম্য সরকার ও মাহমুদুল্লাহ একটা ভালো পার্টনারশিপ গড়ে তুলে স্কোর টাকে ৯৩ পর্যন্ত নিয়ে এলে আবারও উইকেটের পতন হয়। সৌম্য সরকার অত্যন্ত বিচক্ষণ ভাবে খেলে ৪০টি রান করেন কিন্তু তার বিদায়ের পরপরই সাকিবও বিদায় নেন মাত্র ২ রান করে। স্কোর দাড়ায় ৪ উইকেটে ৯৭। মুশফিক মাহমুদুল্লাহর সঙ্গে যোগ দেন। দুজনে মিলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে স্কোর ২৪৩ পর্যন্ত নিয়ে যান। মাহমুদুল্লাহ অনবদ্য খেলে উইকেট হারান ৪৭ রানের মাথায়। মইন আলী খান আউট হয়ে যান।

এর পরে বাংলাদেশী অধিনায়ক মাশরাফী মুর্তজা প্রথম আঘাত হানেন হায়েল্সের উইকেটটি নিয়ে। স্কোর দাড়ায় ৪ উইকেটে ১২৬। বাংলাদেশের তরুণ ফার্স্ট বোলার তাসকিন এই সময়ই টেইলরের উইকেট নিয়ে নিলে ইংল্যান্ড দলের স্কোর দাড়ায় ৫ উইকেটে ১৩৩।

মাশরাফি আবারও উইকেট নিয়ে নেন এই সময় (১৮১/৬) এরপর বাটলার তার উইকেট হারান আর জর্দান অদ্ভুতভাবে রান আউট হয়ে গেলে স্কোর দাড়ায় ৮ উইকেটে ২৪০। আর দরকার ছিল তখন ১৮ বলে ৩০ রান।উত্তেজনা চরমে পৌঁছে যায় যখন দরকার থাকে ১২টি বলে ১৬ রান।রান।এই সময় ম্যাচ মনে হচ্ছিল যে কোন দিকে চলে যেতে পারে।বাংলাদেশী ফার্স্ট বোলার রুবেল হোসাইন ঠিক এই মুহূর্তেই দুটো দুর্দান্ত রিভার্স সুইং এর মাধ্যমে ক্রিসবেড ও আন্ডারসন কে সরাসরি বোল্ড করে দিলে বাংলাদেশ দলের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেলিত ও ঐতিহাসিক জয় এসে যায়। আনন্দে এডিলেডের মাঠ ভেসে যায় বাংলাদেশীদের জন্য। এটা ছিল একটা বিশাল জয় বাংলাদেশ ক্রিকেট , ক্রিকেটার ও বাংলাদেশী মানুষ যারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জন্যে।

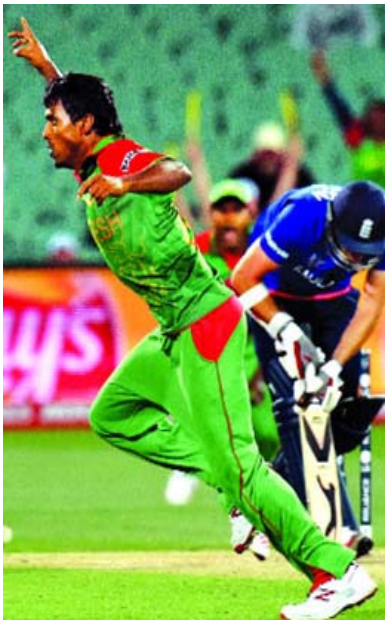

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল: হায়াত মাহমুদ

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল

বিশ্বকাপে চমক ফল

ব্যাটে - বলে বেজায় ধার

রুখবে তাদের সাহস কার?

বোলারের তেজি বলে

ব্যাটিং করলেই সাজ ঘরে।

ব্যাটসম্নদের লক্ষই জয়

বলে বলে দুই- চার -ছয়

মাহমুদুল্লাহ - মুশফি ক্রিকেট বীর

করেছে উঁচু বাঙালির শির

ব্যাটিং বিপর্যয় যখন এলো

মাহমদুল্লাহ ইতিহাস গড়ল

সাকিব হলো ক্রিকেট আলো

বিশ্ব- খ্যাত খেলছে ভালো

মাশরাফিদের কাছে ব্রিটিশ হার

রুবেলই নিল উইকেট চার

যখন রুবেল শেষ উইকেট পেল

কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ গেল

বিশ্ববাসীও মহা খুশী

বাঙ্গালীরা একটু বেশী

এসো সবাই দোয়া করো

সফলতা হউক আরো বড়।

উল্লসিত বোলার রুবেল

বাংলা ভাষা শিখুন:

আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা। বিদেশে থেকেও এই ভাষাকে যেন শিখতে পারি, চর্চা করতে পারি, তার জন্য একটু চেষ্টা করি। আগের পাঠে আমরা বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলি (া, ী, ু, ে, ো, ৌ) শিখেছিলাম। এবার চিহ্নগুলি ব্যবহার করে কিছু শব্দ তৈরি করি।

চিহ্ন ছাড়া শব্দ: জল কল খল ফল বল কলম নরম গরম ইত্যাদি

া-কার চিহ্নযুক্ত শব্দ: জাল কলা খাল গান কালাম বাতাস ইত্যাদি

ী-কার দিয়ে শব্দ: কচি বিল মিল বিবি বীজ রীত ভীত ইত্যাদি

ু ূ-কার দিয়ে শব্দ: বুবু ফুল ভুল চুল কূল মূল হূল ইত্যাদি

-ে-কার দিয়ে শব্দ: তেল বেল লেখ ছেলে মেয়ে নেয়ে ইত্যাদি

ো ৌ-কার দিয়ে শব্দ: তোতা ভোর দোলা পোলা বৌ দৌড় মৌমাছি ইত্যাদি এবার সুবচনের লেখায় যুক্তঅক্ষর শব্দগুলি বাদ দিয়ে অন্য শব্দগুলি পড়ুন। (যেমন- আমাদের, বিদেশে, থেকেও, ইত্যাদি)

বিনোদন:

অপু বিশ্বাস:

বগুড়ার মেয়ে, অপু বিশ্বাস ২০০৬ সালে অভিনয় শুরু করেন। প্রথম ছবি ‘কাল সকালে’। এরপর দাদিমা-তে মোটামুটি সফল; তবে চিত্রনুরাগীদের দৃষ্টি কাড়েন ‘কোটি টাকার কাবিন’ ছবিতে অভিনয়ের পর। সাকিবের সাথে জুটি বেধে করা ছবিটি ব্যবসা সফল-ব্লক বাস্টার। এর পর থেকে সাকিব-অপু জুটি ঢাকার চিত্র জগতে সফল জুটি বলে বিবেচিত হতে থাকে। মাই নেম ইজ খান, ডেয়ারিং লাভার এই জুটির অন্যান্য ছবি।“দেবদাস” চিত্রের রিমেক “পার্বতী”তে ভাল অভিনয় করেন অপু।

ডেয়ারিং ছবিতে সাকিব ও অপু বিশ্বাস

মুম্বাইয়ে ছায়া ছবির রেকর্ড:

হিন্দি ছবি ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লেজায়েঙ্গে’ টানা এক হাজার সপ্তাহ চলে রেকর্ড করেছে। মুম্বাইয়ের একটি সিনেমা হলে সকালের শোতে ১৯৯৫ সাল থেকে ছবিটি দেখান হয়। কাজল-শাহরুখ অভিনীত ছায়া ছবিটি একটি রোমান্টিক ছবি। ইউরোপে ছুটি কাটাতে আসেন কাজল, সেখানে শাহরুখ খান তার প্রেমে পড়েন। কাজলের বিয়ে আগেই ঠিক হয়েছিল। শাহরুখ কাজলের বাবা মাকে বিয়ে ভেঙে দিতে বলেন এবং চেষ্টা করেন তার সাথে বিয়ে দিতে। সে এতে সফলও হয়। এই সাদামাটা কাহিনীর চলচ্চিত্রটি দর্শক মনে প্রচুর আবেগ সৃষ্টি করে। শাহরুখ ভক্তরা তার বাড়ির সামনে থেকে এক পরিচ্ছনতা অভিযান শুরু করে।

কাজল- শাহরুখ

অ্যালোভেরায় রূপবতী:

মাহমুদা রহমান

অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারি একটি প্রাকৃতিক উদ্ভিদ। প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন রোগের ঔষধি ও রূপচর্চার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যাবহার হয়ে আসছে। আধুনিক কালেও এর রয়েছে নানাবিধ

উপকারিতা। চলুন জেনে নেই অ্যালোভেরা আপনার জন্য কিভাবে এবং কি কি উপকার সাধন করে: রোগ প্রতিরোধক অ্যালভেরা বা ঘৃতকুমারীতে রয়েছে ভিটামিন এ, সি, ই, ফলিক এসিড, বি ১, বি ২, বি ৩, বি ১২। প্রায় ২০ রকমের মিনারেলস যেমন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, সোডিয়াম, আয়রন পটাসিয়াম, কপার ইত্যাদি। মানবদেহের জন্য ২২টি অ্যামিনো এসিড প্রয়োজন যার মধ্যে ৮ টি উপাদান থাকা দরকার। প্রধান ৮ টি উপাদানসহ আনুমানিক ২০ টি অ্যামিনো এসিড অ্যালভেরায় বিদ্যমান। তাই প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক গ্লাস অ্যালভেরার সরবত খেলে অনেক ধরনের রোগ প্রতিরোধ হয়।

ত্বকের যত্নে:

অ্যালোভেরা পাতার রস নিয়মিত ত্বকে লাগালে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং রোদে পোড়াভাব দূর হয়। এটি সব ধরনের ত্বকের জন্যই উপকারী। কারণ এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। অতি সংবেদনশীল ত্বক কিংবা ব্রণ ওঠার প্রবণতা যাদের বেশি, তারা অ্যালোভেরা থেকে অনেক বেশি উপকার পাবেন। বিশেষ করে ত্বক কোমল ও মসৃণ করতে এবং ত্বকে ব্রণের দাগ দূর করতেও অ্যালোভেরার রস দারুণ কাজে দেয়। তুলো দিয়ে অ্যালোভেরার রস ত্বকে মেখে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে নিন। কয়েকদিনের মধ্যেই তফাৎ আপনার চোখে পড়বে।

চুলের যত্নে:

পাতার শাঁস প্রতিদিন একবার তালুতে নিয়ম করে লাগালে মাথা ঠাণ্ডা হয়। অ্যালোভেরার রস মাথার তালুতে ঘষে এক ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন। চুল পড়া বন্ধ হবে এবং নতুন চুল গজাবে। শ্যাম্পু করার আগে আধা ঘণ্টা অ্যালোভেরার রস পুরো চুলে লাগিয়ে রাখুন। এতে চুল ঝরঝরা ও উজ্জ্বল হবে।নিয়মিত অ্যালোভেরার শরবত খাওয়া চুলের জন্য ভালো। এতে চুল পড়া অনেকাংশে কমে যায়। খুশকি কমাতেও এটি সহায়ক। অ্যালোভেরায় আছে অ্যালোমিন নামক উপাদান, যেটি চুল লম্বা করতে সাহায্য করে।

রান্না বান্না

কাতলা মাছের কালিয়া

By Asma Khanom (Rumu)

উপকরণ: কাতলা মাছ ৫ টুকরা, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল-চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ চা-চামচ, জিরা বাটা আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, গরম মসলা গুঁড়া আধা চা-চামচ, কাজু বাদাম বাটা ১৪-১৫টি, টমেটো সস ২ টেবিল-চামচ, ময়দা ১ টেবিল-চামচ, ফেটানো ডিম অর্ধেকটা, আলু ডুমো করে কাটা ২টি (মাঝারি), কাঁচা মরিচ ফালি ৪-৫টি, লবণ স্বাদমতো, ঘি বা তেল প্রয়োজনমতো।

প্রণালি: কাতলা মাছ কেটে ও ধুয়ে তাতে হলুদ, মরিচ, আদা-রসুন বাটা, লবণ, ময়দা ও ফেটানো ডিম দিয়ে মাখিয়ে রাখতে হবে ৫ মিনিট। তারপর মাছগুলো ডুবোতেলে ভেজে তুলে রাখতে হবে। আলুগুলো মসলা মাখিয়ে ভেজে রাখতে হবে।কড়াইয়ে ২ টেবিল-চামচ তেল ও ১ টেবিল-চামচ ঘি দিয়ে তাতে পেঁয়াজ বাটা, আদা-রসুন বাটা, জিরা বাটা, ধনে গুঁড়া, কাজু বাদাম বাটা, টমেটো সস দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। মসলা কষানো হলে ১ কাপ দুধ বা পানি দিয়ে তাতে ভাজা মাছ ও ভাজা আলু দিতে হবে। তেল ওপরে উঠে এলে গরম মসলা গুঁড়া ও কাঁচা মরিচ ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে।

English section

Aesop's Fables:

In ancient Greece there was a story teller named Aesop. He was a slave. In his collection there were as many as 500-600 stories. The characters of his stories are mostly animals with their usual habits. They talk like man and do many things. Each story has a moral which gives something to learn. Below three of his stories are given.

Story 1: The fox and a crow

A crow sat on a tree with a piece of meat between his beaks. A fox saw the crow and came under the tree. He thought if I could get the piece of meat. The fox said to the crow, "Oh! What a noble and gracious bird I see.Dear brother, you have so lovely feather and shining color that everyone will envy you. Your voice will be sweet too, I guess. Would you sing for me, please?" The crow became flattered and open his mouth to sing. The piece of meat fell down and the fox taking it went away.

Moral: Do not believe a flatterer.

Story 2: The tiger and the crane

A piece of bone got lodged in a tiger`s throat. The tiger tried much to get rid of it but failed. At last he requested every animal passed by to help him. Tiger also promised a rich reward who will relive him of this danger. No one came to help him. A crane being attracted by reward came to the tiger to help. With his long beak he took the bone out of tiger`s mouth. The crane then demanded the reward which the tiger promised. The tiger became angry and said, "Is it not enough reward that you could take your beak out of my mouth? I could have eaten you."

Moral: Do not expect gratitude.

Story 3: A fox in a grape garden

A fox while passing through a vine yard saw many grapes hanging. The grapes are ripe and full of juice. The fox thought the grpes will be very sweet. I must have them. The grapes were hanging on a fence which was much high above for the fox to reach. The fox jumped at them but could not reach. At last the fox gave up the idea to get them thinking the grapes might be sour.

Moral: It is easy to hate what you can not have.

Cake Making

By Parisa Lasker

What started out as a hobby is now her own brand and business, Ardor & Bliss. Parisa Lasker unknowingly began her baking journey by watching YouTube videos and baking for family and friends. It soon became clear that she couldn't put the baking tools away. As she finishes off her Bachelor of Commerce degree, Parisa continues to create new delicious treats for her growing customer base and social media following. Since announcing the business on Facebook a little over a year ago, Ardor & Bliss has reached almost 3,400 followers and continues to grow.

Homemade Marshmallow Fondant

Ingredients –

- 3 tbsp of Glucose/corn syrup
- 3 tbsp of Unsalted butter
- 3 tbsp of water
- 1/2 tsp of Vanilla extract
- 450 gm of Marshmallow
- 900gm of Icing/ Powdered confectioner's sugar

Method -

1. In a microwavable bowl, add all the ingredients except icing sugar (corn syrup, butter, water, vanilla and marshmallows).

2. Heat the bowl in the microwave for 1 minute and 20 seconds. After taking it out, stir it thoroughly and let it cool for 5 minutes (don't exceed more than 10 minutes or it will harden).

3. In a bigger bowl, combine the above melted ingredients with 500 gm of icing sugar. The combination will form a pasty dough.

4. With the rest 400 gm of the icing sugar, find a clean surface where you can knead your fondant. Place the rest of the icing sugar on the surface and on top of that you're half ready fondant. You will need to knead the remaining icing sugar in and you will see your fondant starting to form into a soft dough consistency. If you see the fondant is sticking to your hands more sugar. You will know when your fondant is ready when it is a little softer than play-dough consistency & by holding it with the tip of your fingers you will be able to see it stretch slowly (if it stretches too quickly, keep adding sugar as it needs to thicken).

5. Store it in an airtight container or bag in room temperature for up to 6 months.

Facebook: facebook.com/ardorxbliss
Instagram: @parisalasker

Al Madina Halal Meat

Fresh quality halal meat at affordable prices

Provides good customer service

We also sell Bangladeshi frozen fish: Hilsha, Ruhi, Mrigal,

Katla and many others.

Shop 2, 6 Douglas Road, Quakers Hill NSW 2763

Proprieter: Mohammed Faruk Ahmed

Chocolate Mousse Cake

By Afra Nawar (Shairy)

Ingredients for the cake –

- 150g butter
- 100g sugar
- 1 cup of sifted self-rising flour
- Half cup cocoa powder
- 2 eggs
- 1 tea spoon of vanilla essence
- 100mL milk

Ingredients for the mousse –

- 300g of dark chocolate
- 200mL thicken cream
- 1 teaspoon of powder gelatine
- 400mL thicken cream

Method for the cake –

1. Soften the butter and beat it in low speed for 3 minutes
2. Add the sugar and vanilla essence to the butter and beat for another 4 minutes
3. One by one add the eggs and beat it thoroughly (do not overbeat the eggs)
4. Sift in the flour and cocoa power and fold in the dry ingredients until mixed well
5. Add the milk, in the beginning it will take some time for the milk to combine in however with continuous gentle mixing the milk will mix in perfectly with the cake mixture (The milk helps the cake be moist)
6. Bake in the oven for 35-40 minutes in 160 degrees (after 30 minutes put a skewer or knife in the middle of the cake, if knife/skewer comes out clean take the cake out of the oven or else let it bake it for another 5-10 minutes and repeat the process of testing by putting a knife/skewer through it)

Method for mousse –

1. Break the chocolates in pieces in a microwave safe bowl and add 200mL of thicken cream. Heat it in the microwave for 1minute, take it out of the microwave and stir it and put it back in the microwave for another 30 seconds. After the 30seconds the chocolate should be completely melted.
2. Beat the chocolate and cream mixture until cream is mixed in completely with the chocolate and no lumps are left.
3. In a small bowl put 1 tea spoon of gelatine power and 3 tea spoon of warm water to dissolve the gelatine. Once the gelatine is combined and sticks together put it in the chocolate mixture and beat again until gelatine dissolves in.
4. In a separate bowl beat 400mL of thicken cream until soft peak form (do not overbeat cream as it will become watery and not the right consistency)
5. Fold half of the whipped cream into the chocolate mixture. When completely folded, fold in the rest of the whipped cream. The dark chocolate will become a light chocolate brown colour.
6. Place the chocolate cake at the bottom of a spring form tin. Pour in the chocolaye mousse mixture and set it in the fridge for 4 hours-overnight. Get the mousse out 1 hour before serving. Decorate with whipped cream and chocolates or strawberries.

Wake Up Call

By Fahreena Huda (Noreen)

Sometimes i get this feeling,
This deep and deadly feeling
That there has to be more than this,
That is world can't be just a hit and miss

But the harder i try to achieve,
The more complex a web i weave
Until i get tangled up in all my struggles,
And i wonder if its worth all the trouble

Why is the world so hard on me?
When everyone else is where they want to be
Why am i the one always stuck in a hole
Where i feel without a heart and live without a soul

But one day i make a friend
And she helps me set a trend
When i feel like i'm drowning in quick sand,
She's the one always there to hold my hand

Its only when i get much older
That i decide to look over my shoulder
And i realise that my friend was not a person at all,
Instead it was the remnants of my soul
Giving me a much needed wake up call

**"অন লাইনে সুবচন পড়ুন--
www.sydneybashi-bangla.com**